

ডেজানে মেসান্ন

[গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়]

আব্দুল্লাহ্ আদ মুনির



সূচীপত্র

ক্রঃনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	আরজ	৫
২.	ভূমিকা	৭
৩.	একটি উদ্ভট প্রস্তাবনা	১২
৪.	পরমত সহিষ্ণুতা	১৫
৫.	“তোমার ধীন তোমার আমার ধীন আমার” কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা	১৬
৬.	অধিকার ও অনুমোদনের মধ্যে পার্থক্য	১৮
৭.	জিজিয়া (الجزية)কর বলতে কি বোঝায়?	১৮
৮.	জিজিয়া অমুসলিমদের অধিকার নয়, এটা স্থায়ী বিধানও নয়	১৮
৯.	জিজিয়া গ্রহণ করা অর্থ বিধর্মীদের স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেওয়া নয়	২২
১০.	কাউকে ক্ষমা করা বা সুযোগ দেওয়া অর্থ তাকে মেনে নেওয়া নয়	২৫
১১.	মদিনার সনদ	২৭
১২.	মানবতা ও গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলে ইসলাম হতে মানুষকে ফেরানোর চেষ্টা	২৮
১৩.	রসূল (ﷺ) ও খোলাফায়ে রাশেদা কি গণতান্ত্রিক ছিলেন?	৩০
১৪.	অগণতান্ত্রিক আচরনের দলীল-প্রমাণ	৩১
১৫.	*এপ্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর কিছু কথা	৩১
১৬.	*গণতন্ত্রের প্রতি নবী সুলাইমান (ﷺ) এর দ্যার্থহীন হুমকী	৩৪
১৭.	*কাফিরদের আগে আক্রমণ করা বৈধ কিনা?	৩৭
১৮.	“দ্বীনের মধ্যে কোন জবরদস্তী নেই” কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা	৩৭
১৯.	অন্য ধর্মের লোকদের বিশ্বাসে ও কর্মের সমালোচনা	৩৯
২০.	ইব্রাহীম (ﷺ) এর মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনী	৪০
২১.	ইসলামের ইতিহাসে মূর্তি ভাঙ্গার আরো কিছু ঘটনা	৪৪
২২.	‘কোন অমুসলিম কষ্ট পাবে এই জন্য তার ধর্মকে সমালোচনা করা যাবেনা’ এ কথার কোন ভিত্তি নেই	৪৬
২৩.	“তাদের উপাস্যদের মন্দ বলো না” এ কথার সঠিক অর্থ	৪৮
২৪.	উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ	৫০
২৫.	ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এ আকিদার উপর গণতন্ত্রের আঘাত	৫০
২৬.	অন্য ধর্ম ও তার কৃষ্টি-কালচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৫১

২৭.	অমুসলিমদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার	৫৬
২৮.	অমুসলিমদের মুসলিম হতে বাধ্য করা কি অন্যায়?	৫৬
২৯.	গণতন্ত্রের আরেকটি শিক্ষা হলো কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা যেমন শাসন ব্যবস্থা চাই সেটাই মেনে নিতে হবে যদিও তা অনিসলামী হয়	৫৭
৩০.	ভেজাল গণতন্ত্র	৫৮
৩১.	ইসলামী গণতন্ত্র এবং এর নামকরণ প্রসঙ্গে কিছু কথা	৫৮
৩২.	কিছু মিল থাকলেই কি একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর নামে ডাকা যায়?	৬২
৩৩.	গণতন্ত্র ও খিলাফতের মধ্যে পার্থক্য	৬৩
৩৪.	খলিফার ক্ষমতায়ন	৬৪
৩৫.	পূর্ববর্তী খলিফার পক্ষ হতে পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করে যাওয়া	৬৪
৩৬.	একজন খলিফা পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করে যাওয়ার বিষয়টির যৌক্তিকতা	৬৮
৩৭.	শুরা বা মশাওয়ারার সাথে ভোটভূটির পার্থক্য	৬৯
৩৮.	ইসলামে মশাওয়ারার মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি	৭০
৩৯.	জনমতের গুরুত্বের ব্যাপারে গণতন্ত্র ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য	৭১
৪০.	পরামর্শের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচন করার দ্বিতীয় পদ্ধতি	৭৪
৪১.	ইসলামে জনসমর্থন নয় বরং রায়াতের ভূমিকায় প্রধান	৭৭
৪২.	খলিফার ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইসলামের আরো কিছু অগণতান্ত্রিক নীতি	৭৮
৪৩.	খলিফা কুরাইশী হতে হবে	৭৮
৪৪.	মেয়েদের খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না	৮০
৪৫.	জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী সঠিকভাবে দেশ শাসন করলে তার আনুগত্য করা ওয়াজীব হবে	৮১
৪৬.	খলিফার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন	৮৬
৪৭.	খলিফাকে অপসারণ	৯২
৪৮.	ভেজালেও মেশাল্	৯৪
৪৯.	কুফরিকে মেনে নিয়ে ইসলামী আন্দোলন সম্ভব নয়	৯৫
৫০.	অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কেবল বাহ্যিকভাবে কুফরিকে মেনে নিলেও ঈমান ভঙ্গ হয়	৯৮
৫১.	বেশিরভাগ লোকের ভোটে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাটা বাস্তবসম্মতও নয়	১০০
৫২.	গণতন্ত্রের বিকল্প	১০৪
৫৩.	ইসলাম কায়েমের সঠিক পদ্ধতি	১০৬
৫৪.	জিহাদ করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা শর্ত কি?	১১৯

কোন কুফরী ব্যাবস্থা যারা তৈরী করে আর যারা ইসলামকে প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করে উক্ত ব্যাবস্থাকে গ্রহন করে তারা আমাদের কেউ না। আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন আর তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু যে সব অবুঝ জনসাধারণ উক্ত ব্যাবস্থাকে ইসলামী ব্যাবস্থা মনে করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা পালন করে তাদের ব্যাপারে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু আশা রয়েছে যে, তারা আল্লাহকে ভয় করবে ও উপদেশ গ্রহন করবে।

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى (৫) فَأُتِيَ لَهُ تَصَدَّى (৬) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبِي (৭) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (৮) وَهُوَ يَخْشَى (৯) فَأُتِيَ عَنْهُ تَلَهَّى (১০) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (১১) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ (১২) [عبس/১-১২]

যে অহংকার করে তুমি তার প্রতি মনোনিবেশ করো আর যে তোমার কাছে ছুটে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে তুমি কি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও? কখনও নই এটাতো উপদেশ বানী মাত্র যে চায় উপদেশ গ্রহন করুক। (আবাসা ৫-১২)

অতএব বক্ষমান গ্রন্থে আমরা শুধুমাত্র তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছি যারা গণতন্ত্র কে ইসলামী মোড়কে উপস্থাপন করে। আমরা কেবল চাই আল্লাহ সকল মুসলিমকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমি আশা করব পাঠক আমাকে আপনজন ও উপকারী বন্ধু মনে করেই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন এবং যদি গ্রন্থে উল্লেখিত কোন বাক্যে কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে সেটাকে কোন নিকটতম বন্ধুর হিতকর উপদেশ বলেই মনে করবেন।



<# ভূমিকা #>

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والرسلين اما بعد.....

এটা অসম্ভব নই যে, রেস্তুরাতে চা পানরত অবস্থায় অথবা বন্ধুদের সাথে খোশগল্পের মাঝে উপস্থিত কারও পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন শুনে থাকবেন,

- জনাব, ইসলামে কি গণতন্ত্র বলে কিছু আছে?

মাদ্রাসাতে পঠন পাঠনে বহুকাল ব্যায় করেছেন এমন একজন পাগড়ি পরিহিত, মুখমন্ডলে লম্বা শরফ মন্ডিত সর্বজন স্বিকৃত বা স্বঘোষিত পন্ডিতকে কছাকাছি পেয়েও যেতে পারেন যিনি নিতান্তই ব্যাতি ব্যাস্ত হয়ে বলবেন,

-নিশ্চয় আছে, ইসলামই তো পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র শিখিয়েছে। আল্লাহর রসুল (ﷺ) নিজে এবং তার খোলাফায়ে রাশেদা (رضي الله عنهم) গনতন্ত্রের মূলনীতির উপরই রাষ্ট্রীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন।

আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী শ্রোতা হয়ে থাকেন তবে এই ঘটনার পূর্বে বা পরে সমপর্যায়ের বেশভূষা ও গান্ধির্যপূর্ণ অন্য কারও মুখে ঠিক এর বিপরীত কথাও শুনে থাকবেন। অসম্ভব নই যে, আপনি উভয়ের কোন একজনের কথায় প্রভাবিত ও বিমহিত হবেন অথবা পন্ডিত বর্গের মতামতগত বিশৃঙ্খলাহেতু আপনার মন মস্তিষ্ক বিচলিত ও অপ্রকৃতিস্থ হবে।

পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি প্রশ্নের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা সামাধান আনয়ন অসম্ভব ও দুরহ মনে হওয়ায় গণিতের ছাত্রের মত বিরক্ত হয়ে বলবেন,

- এসবে আমার কি প্রয়োজন! আমি তো সলাত সওমের পাবন্ধ করি। গণতন্ত্র জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়ার সাথে আমার পরকালের কি সম্পর্ক! নিতান্ত অবচেতন ভাবেই এই চিন্তা আপনার মানষপটে চিত্রিত হতে পারে।

আলোচিত ব্যক্তি যদি ইসলামবিদ্বেষী হয় তবে নিশ্চয় হংসের মত হিস হিস করে হেসে বলবেন,

- মুসলিম পণ্ডিতদের চিরকাল এই একই দশা।

আমি আপনাকে বলব, দশ জনের দশ মতে দিশেহারা হয়ে ইসলামকে দুষ্ট করা বা নিজে ক্লিষ্ট হওয়ার কোন যৌতিক কারন নেই। দুনিয়ার কোন্ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিতে ততসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দেয়নি? পদার্থ বা জীব বিজ্ঞানের কোন সূত্রের কথায় ধরুন অথবা পৃথিবী ধংস বা সৃষ্টি সংক্রান্ত কোন প্রসিদ্ধ তত্ত্ব। সত্য একটিই কিন্তু একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির তথ্য ভিন্ন ভিন্ন উপাত্ত দ্বারা পরিপূর্ণ। আল্লাহ না করুন যদি আপনি কোন জীবননাশক রোগে আক্রান্ত হন তবে কি বলতে পারেন অভিজ্ঞতা ও খ্যাতির দিক থেকে দুনিয়ার প্রথম সারীর দুজন ডাক্তার আপনার চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরোপুরি একমত হবেন? ডাক্তারদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে কিনা যিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনার মৃত্যু অবিলম্বিত করতে পারেন? অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হওয়ার পর নিজের একটি কিডনি খুঁজে পাননি এমন মানবেতর ঘটনা আপনার জানা আছে কিনা? যদি জ্ঞান ও মানে স্বীকৃত ডাক্তারদের মধ্যে এমন শিশুসুলভ আচরণের অধিকারী ব্যক্তি সত্যিই থেকে থাকে তবে কি আপনি চিকিৎসা নামক বস্তুটাকেই পরহেজ করে চলবেন? আপনি কি রোগাক্রান্ত জীবনটাকে বিনা চিকিৎসায় বিনাশ হতে দেবেন? এমন সিদ্ধান্তই কি আপনার পক্ত বিচার বুদ্ধির পরিচায়ক হবে? নিশ্চয় তা করবেন না। ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের ডাক্তার বিদ্যমান থাকার কারনে চিকিৎসা বর্জন করার মত সহজ সিদ্ধান্ত নই বরং সতর্কভাবে নির্ভর যোগ্য ডাক্তার নির্ণয় করে চিকিৎসার গুরুভার তার উপর অর্পন করবেন এবং মোটা অংকের টাকা খরচা করে জীবনটাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করবেন।

কেন এমন করবেন?

কারন, আপনার নিকট চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা যে কোন মূল্যেই সম্পাদিত করতে হবে। শরীর ও মনকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তাই বেহাতে পড়ে নাজেহাল হওয়া এবং বর্তমান রোগাক্রান্তের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর ও বেদনা দায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবল ও প্রকট সম্ভবনা স্বত্ত্বেও যথা সম্ভব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই হয়। এর কোন বিকল্প নেই। আপনি কেবল সতর্কভাবে পর্যবেক্ষন করে জেনে নেবেন যার উপর আস্থা রাখছেন সে কতটুকু আস্থাশীল।

এটাই যদি হয় বাস্তবতা তবে আপনার জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান সমূহের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার মাধ্যমে নিজের পরকাল নিরাপদ করা রোগাক্রান্ত শরীরকে সুস্থ করার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ এবিষয়ে কোনরূপ উদাসিনতার পরিচয় দেয় তবে তার এই সুস্থ তরতাজা শরীর জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে, পাহাড়সম হাতুড়ি তলে পিষ্ট হবে। বলাবাহুল্য যে, এটা মোটেও সুখকর হবেনা। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « يُؤْتَى بِأَنَعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ يُؤْسَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ يُؤْسَا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ

لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সুখ ভোগ করেছে এমন একজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে তার পর জাহান্নামের ভিতর একবার চুবানি দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোন সুখ ভোগ করেছ? তুমি কখনও কল্যানকর কিছু পেয়েছ কি? সে বলবে না হে আমার রব তোমার কসম। একইভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখি ব্যক্তিকে নিয়ে এসে জান্নাতের এক পরশ দেওয়ার পর প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোনও দুঃখ পেয়েছ? জীবনে কখনও কষ্টদায়ক কিছু অনুভব করেছো কি? সে বলবে না হে আমার রব তোমার কসম আমি কখনও কোনও কষ্ট পাইনি। আমি কখনও কোন সমস্যা পড়িনি।

(মুসলিম)

জাহান্নামের এক পরশেই যদি দুনিয়ার যাবতীয় সুখ ও ভোগ ভুলে যেতে হয় তবে নিজ দেহকে রোগমুক্ত রাখার চেয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ রাখা যে বেশী সুখকর ও অধিক জরুরী তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। নিজেই সেই জান্নাতের জন্য ব্যাস্ত রাখা দরকার যেখানে একটি মুহূর্ত অবস্থান করাটা সমস্ত দুঃখ কষ্টের জন্য আরগ্য হিসাবে কাজ করে। সমস্ত রোগের চিরস্থায়ী সামাধান একজন মুসলিমের নিকট বেশী কাম্য। এস্থলে নাস্তিকমনা কেউ কৌতূকের স্বরে বলতে পারে

- এসব রূপকথার কাহিনী তো আমরা বহু পূর্বেই অবিশ্বাস করেছি।

তাকে বলো, এই যে তুমি বৃষ্টিবর্ষনকারী নীল আকাশের নিচে গাছ ও ঘাস বিছানো সবুজ পৃথিবীতে হেটে হেটে আরমদায়ক ভ্রমণ করছো, লম্বা নিশ্বাসে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও শীতল বায়ুর স্বাদ ভোগ করছো, দিগন্তে দৃষ্টি বিস্তৃত করে নানা রঙের নানা খেলায় তোমার হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। তোমাকে কে সৃষ্টি করল? কেই বা তোমাকে এই মনরোম ও আরাম দায়ক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করার সুযোগ করে দিল? তুমি দেখবে প্রশ্নটি শেষ করার আগেই সে বলে উঠবে,

- এ সব কিছু হঠাৎ হয়েছে, কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা চোখ মেলেই দেখছি আমরা এই মনহরীণী বিশ্বের বাসিন্দা। এর পিছনে কোন কারন নেই, এর জন্য কারও কোন অবদান নেই।

তাকে আরও একটি হঠাৎ ঘটমান ঘটনার সম্ভবনার কথা বলো। তাকে বলো যদি হঠাৎ আকাশ হতে একটি বৃহদাকৃতির পাথর নিক্ষিপ্ত হয় তার দুই দিন পর আরও একটি, এভাবে কয়েকটি, তবে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে সমআকৃতির বা তারচে ছোট বা বড় আরও একটি পাথর কোন কারন ছাড়াই হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা আছে কিনা? তাকে বলো যেভাবে চোখ মেলে হঠাৎ এই নীল আকাশ ও সবুজে ঘেরা পৃথিবীতে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে ঠিক অনুরূপই একদিন হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর অগণিত অসংখ্য ধাবমান মানুষের মধ্যে নিজেকে ছুটছুটিরত অবস্থায় আবিষ্কার করবে। সেদিন হঠাৎই তোমার বিচার কার্য আরম্ভ হয়ে যাবে। তোমাকে টেনে হেচড়ে জাহান্নামের নিয়ে যাওয়া হবে। যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আর অরুচিকর

খাবার খাওয়ার সময়ও তুমি বুঝতে পারবে না তুমি কিভাবে এখানে এলে। যা কিছু নির্ধারিত ছিল তার সব কিছুই সম্পাদিত হয়ে যাবে। জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন

أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ [الأحقاف/ ٣٤]

এটা কি সত্য বিষয় নই? তারা বলবে হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম এটা সত্য বিষয়। আল্লাহ বলবেন অতএব তোমরা যে অস্বীকার করতে তার বিনিময় হিসাবে এই শাস্তির স্বাদ ভোগ করতে থাকো।

(আলআহকাফ - ৩৪)

যেভাবে সে আকাশ পৃথিবী আর উভয়ে যা কিছু ধারণ করে সমস্ত কিছুকেই হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিষয় বলে দাবী করে তুমি তাকে বলো পুরোপুরি একই নিয়ম ও পদ্ধতিতেই দ্বিতীয় ঘটনটিও ঘটে যাওয়ার সম্ভবনা কিভাবে অস্বীকার করতে পারো? কেবলমাত্র বুদ্ধি বিবর্জিত লোকেরাই নাস্তিকতার প্রচার করে আর বকলম, বধিররা তাদের অনুসরণ করে।

আমরা আবার প্রাসঙ্গিক আলোচনাতে ফিরে আসব। ডাক্তারদের মতপার্থক্যের কারণে বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি চিকিৎসা বর্জন করেননা কারণ চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন বিশ্বাসী মুসলিমের নিকট জান্নাত জাহান্নামের বিষয়টি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি সুক্ষ্মতিসুক্ষ্ম ব্যাপারে কোরআন হাদীসের রায় কি, কোন বিষয়টি জায়েজ, কোনটি না জায়েজ এসব ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা অনু পরমানু বা জীবানু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তুলনায় ঢের বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারন এসব বিষয়ের সাথে আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম জড়িত রয়েছে। আলেমদের মতপার্থক্যে নিরাশ হয়ে দমে গেলে চলবে না। মতপার্থক্য কোন নতুন বিষয় নয়। মতপার্থক্য সর্বযুগেই ছিল, আছে এবং থাকবে। মতপার্থক্য নিরসনের জন্য অপেক্ষা করলে নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। মতপার্থক্য নিরসন হওয়ার সম্ভাবনা তিরহিত। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَكَلِمَةً رَبُّكَ

لَأُمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [হুদ/ ১১৮, ১১৯]

তোমার রব চাইলে মানুষকে একই মতালম্বি করতে পারতেন কিন্তু তারা মতপার্থক্য করতেই থাকবে আল্লাহ যাকে রহম করেন সে ভিন্ন (অর্থাৎ সে সত্য পথ প্রাপ্ত হবে) তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে এ জন্য (অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের উপস্থিতি থাকবে এবং একদল জান্নাতী আর অন্যদল জাহান্নামী হবে) তোমার রব ওয়াদা করেছেন যে তিনি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দ্বারা ভর্তি করবেন।

(হুদ / ১১৮, ১১৯)

আল্লাহর রসুল (ﷺ) পূর্বেই ভবিষ্যৎবানী করে বলেছেন

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً . وَإِنَّ أُمَّتِي سَفَّتْ فَقَرَقَ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً . كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

বানী ইসরাইলেরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত হবে একটি ছাড়া বাকিরা জাহান্নামী হবে^(১)

অতএব যে ঘটনা ঘটীর খবর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে তা ঘটতে দেখলে অবাক হওয়াটা মোটেও যুক্তি যুক্ত নই। নানা জনের নানা পথ ধরতে দেখে হতদম্য হলে চলবে না। কোনরূপ বিচার বিবেচনা ছাড়াই কোন একটি পথে নিজের জীবন পাত করাটাও নিরাপদ নই কারন রসুলুল্লাহ (ﷺ) স্পষ্টই বলে দিয়েছেন

كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

একটি ছাড়া বাকি দলগুলো জাহান্নামী (পূর্বজ হাদীসের অংশ)

এত দুঃসংবাদের মধ্যে কিছু সুসংবাদও আছে। যারা চোখ কান খোলা রাখে, সত্য অনুসন্ধান করে আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت/৬৭]

যারা চেষ্টা করে আমি তাদের সঠিক পথ দেখায়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন। (আলআনকাবুত/৬৯)

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [البقرة/২১৩]

অতঃপর আল্লাহ যেসকল বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছিল মুমিনদের সেসব বিষয়ে সঠিক পথ দেখালেন। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে খুশি সত্যপথ প্রদর্শন করেন।

(আলবাকারা/২১৩)

সুতরাং মতপার্থক্যের কারনে হতাশ হওয়ার কোন কারন নেই। অন্ধের মত কোন একটি দলের পিছু নিয়েও লাভ নেই। বরং নিজের বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সত্য সন্ধানের জন্য নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। আল্লাহ আপনাকে যে দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন তা ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ উদাসিনতার পরিচয় দিলে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসীত হতে হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء/৩৬]

^(১) (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাযা। রেওয়ায়েতটি ইবন মাযার এবং আলবানী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন)

তুমি না জেনে কোন কিছুর অনুসরণ কর না। নিশ্চয় শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং বুদ্ধি বিবেক সম্পর্কে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে।

(বনী ইসরাইল/৩৬)

যারা বর্তমানে গণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতামতে প্রকৃতই উদ্ভিন্ন হয়েছেন এবং অকৃত্রিমভাবে এ সমস্যার সামাধান পেতে আগ্রহী আমি তাদের অনুরোধ করব সামনের সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে মনযোগ নিবদ্ধ করার জন্য। হয়তো আল্লাহ তাদের জন্য সামাধানের পথ খুলে দেবেন। আমি তারই নিকট সাহায্য চাই এবং তারই সম্ভ্রষ্টি কামনা করি। তিনি যেন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির মাধ্যমে পাঠক ও আলোচক উভয়কেই উপকৃত করেন।

আমীন

<# একটি উদ্ভট প্রস্তাবনা #>

এক ভদ্রলোকের কথা কল্পনা করুন যিনি শহরে চাকুরী করেন। গ্রামে তার কয়েক বিঘা জমি আছে। বছরে পাচ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে ভদ্রলোক সেই জমিগুলো একজন গরীব চাষাকে দিয়েছেন চাষ করার জন্য। ভদ্রলোক শহরে এতটাই ব্যাস্ত থাকেন যে, বছরে একবারও গ্রামে স্বশরীরে হাজীর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়না। বছরান্তরে চাষা নিজে শহরে এসে পাওনা টাকাটা পরিশোধ করে যায়। সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল হঠাৎ ঘটে বিপত্তি। কয়েক বছর চাষাকে টাকা পরিশোধ করতে আসতে দেখা যায়না। ঘটনা কি জানার জন্য শত অপারগতা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ভদ্রলোককে গ্রামমুখো হতেই হল। গ্রামে যাওয়ার পরই তিনি বুঝতে পারলেন আসল ঘটনা কি। এতদিনে চাষা জমিটা দখল করার প্রায় সব রাস্তা পাকা করে ফেলেছে কেবল দলিল নেই এই যা। বছরে যে পাচ হাজার টাকা ভদ্রলোকের জন্য বরাদ্দ ছিল সেটা খরচ করেছে গ্রামের লোকদের পিছনে। তার জমিতে যা চাষ হয় গ্রামের কয়েকঘর লোক তা থেকে পর্যাপ্ত পরিমান পায়। কিন্তু বেচারী শহরে লোকটা জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও সব কিছু থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ভদ্রলোক চাষার নিকট পাওনা টাকা চাইতেই সে চেচিয়ে বলে

কিসের টাকা?

গ্রামের অন্য সবার সাথে কথা বলেও সুবিধা হলনা। তাদের একই কথা

বেচারী গরীব মানুষটা তো শান্তিতেই করে কর্মে খাচ্ছে কেন বাপু তুমি এখন এসে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করছো?

এহেনো করুন পরিস্থিতিতে ভদ্রলোকের অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল। হঠাৎ দেখা গেল একজন বয়স্ক সম্মানিত ব্যক্তি সেই পথ দিয়েই দ্রুত পায়ে কোথাও যাচ্ছেন। তাকে দেখেই উপস্থিত সবাই তড়ি ঘড়ি করে উচু স্বরে সালাম দেয়। ভাব সাব দেখে মনে হল তিনি এগ্রামের সর্বমান্য ব্যক্তি। ভদ্রলোক শেষ চেষ্টা হিসাবে তাকেই সব কিছু খুলে বললেন। সর্বমান্য ব্যক্তিটি গণতন্ত্রমনা ছিলেন। সব

শুনে তিনি কিছুক্ষন নিরব থাকলেন। আশপাশেও পিন পতন নিরবতা বিরাজমান ছিল। বোঝাই যাচ্ছে আগন্তুক যে রায় দেবেন তাই গ্রহন যোগ্য হবে। বেশ কিছুক্ষন চিন্তা গবেষণা করে গ্রাম্য ভদ্রলোকটি মুখ তুলে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন

-এ গ্রামের বেশিরভাগ লোক যার পক্ষে রায় দেয় জমিটি তারই হস্তগত হবে।

এধরনের বিচার শুনে শহুরে ভদ্রলোকটি তো আকাশ থেকে পড়লেন। চোখ কপালে তুলে বললেন,

আমার নিকট তো দলিল প্রমান রয়েছে ভোটাভোটি করতে যাবো কেন?

মুসলিমদের নিকট গণতন্ত্র ঠিক এমনই উদ্ভট প্রস্তাবনা পেশ করেছে। সে কাহিনী আরও লম্বা, আরও বেদনা দায়ক। তবু আমরা সে কাহিনী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করতে চাই। আশা করি বিরক্তির উদ্বেক হলে ধৈর্য অবলম্বন করবেন।

আল্লাহ (ﷻ) এই সমস্ত বিশ্বকে সৃষ্টি করলেন, মানুষ সৃষ্টি করলেন যাতে তার ইবাদত করা হয় এবং তাকে ছাড়া অন্য সমস্ত উপাস্য পরিত্যক্ত হয়। তার ধর্ম ও বিধি বিধান পালন করা হয় এবং তা ভিন্ন যে কোন মতবাদ ও দর্শন বর্জিত ও নিষ্ফল হয়। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف/৫৬]

শুনে নাও সৃষ্টি করেছেন তিনি তারই বিধান চলবে তিনি মহামান্বিত, এই বিশ্বের প্রভু।

(আরাফ/৫৪)

তবু মানুষ যুগে যুগে শয়তানের ধোঁকায় প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন বাতিল মত ও পথ ধরেছে। রব্বুল আলামীন তাদের সতর্ক করার জন্য সময় ও স্থানের প্রয়োজন সাপেক্ষে লক্ষ লক্ষ নবী রাসুল (ﷺ) প্রেরন করেছেন। তারা মানুষকে ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আনার জন্য আমরন চেপ্টা তদবীর করেছেন তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি বর্ষিত হক। সমস্ত ধর্ম ও মতকে ধ্বংস ও নিঃচিহ্ন করার জন্য নবী রাসুলদের (ﷺ) নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে সাথে সাথে স্বীকার হতে হয়েছে অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতনের। কাউকে হত্যা করা হয়েছে, কাউকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হয়েছে। কোরআনের বেশির ভাগ আংশেই নবী রসুলদের (ﷺ) শিক্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তারা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি তাদের সংগ্রাম ছিল শুধু মাত্র ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং অন্য সমস্ত ধর্ম ও দর্শনকে ভুলুষ্ঠিত করার।

ইসলাম পূর্ববর্তী আরবের অবস্থাও অনুরূপই ছিল। আল্লাহর পবিত্র ঘরে ৩৬০ টি মূর্তির পূজা করা হত। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করা হত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) নবুয়ত পূর্ববর্তী জীবনে নিজে কখনও মূর্তি পূজা করেননি কিন্তু কাউকে নিষেধও করেননি। তখন পুরোপুরি গনতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল তাকেও কেউ মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করত না তিনিও কাউকে নিষেধ করতেন না, বাধার

সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই অবস্থার পরিবর্তন চাইলেন। তিনি হিরা গুহাতে তার রসুলকে স্বীয় বানী ও কিতাব শিক্ষা দিলেন তাকে আদেশ করলেন মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে তাদের শিরক কুফরের অন্ধকার হতে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসতে। সমস্ত ধর্ম ও মত পরিত্যাগ করে আল্লাহর দীন ইসলাম গ্রহণ করতে। সুতরাং তিনি পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে সত্যের ঘোষণা দিলেন। মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করল। শুরু হল শিরক কুফরের বিরুদ্ধে তার ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবন। সাল্লাহল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আমরা যে কাহিনী বর্ণনা করলাম তা সর্বজন বিদিত। আপনি ইবন হিশাম, আলবিদায়া ওয়ান নিহাইয়া বা অন্য কোন সিরাত গ্রন্থ পাঠ করলেই এতটুকু কথা বুঝতে পারবেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে নিচের কয়েকটি দলীলের প্রতি মননিবেশ করলেই প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমানিত হবে।

كِتَابٌ أُنزِلَتْهُ إِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ [إبراهيم/১]

এই কিতাব আমি আপনার উপর নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিতে পারেন

(ইবরাহীম/১)

উক্ত আয়াতে অন্ধকার বলতে শিরক কুফর ও সমস্ত প্রকারের পথভ্রষ্টতাকে বোঝানো হয়েছে আর আলো বলতে ঈমান ও হেদায়েতকে বোঝানো হয়েছে।^(২)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [الأنبياء/২০]

আমি তোমার পূর্বে যে রসুলকেই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এই ওহী করেছি যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।

(আম্বিয়া/২৫)

একইভাবে সুরা ইব্রাহীমে বলা হয়েছে যখন নবীরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট এক আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত দিয়েছেন তাদের সম্প্রদায়েরা বলেছে

تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا [إبراهيم/১০]

আমাদের পূর্বপুরুষরা যার ইবাদত করত তোমরা তো তা থেকে আমাদের ফিরাতে চাও।

(ইব্রাহীম/১০)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) শিরক কুফরের বিরুদ্ধে তার প্রচার অভিযান শুরু করলে আবু জেহেল বলল

^(২) (তাফসীরে জালালাইন বায়দাবী ও অন্যান্য)

يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا ، وشتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وسب آلهتنا ، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ، فإذا سجد في صلاته فضحت به رأسه (دلائل النبوة للبيهقي - (ج ٢/ص ٦٥)

ওহে কুরাইশেরা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ মুহাম্মদ কি করছে। সে তো আমাদের ধর্মকে ভুল বলছে আমাদের পূর্বপুরুষদের মন্দ বলছে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে খাটো করছে আমাদের উপাস্যসমূহকে তিরস্কার করছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আগামীকাল আমি একটি পাথর নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করব যখনই সে সাজদা করবে আমি তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করব।

(বায়হাকী দালাইলুন নুবুওয়াহ)

আমর ইবন আল মুররাহ মুসলিম হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে তার নিজ সম্প্রদায়ের নিকট দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠালে তারা বলল

أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا القرشي من أهل تهامة (السيرة النبوية لابن كثير - (ج ١/ص ٣٧٧)

তুমি কি আমাদের আদেশ করছ আমাদের উপাস্যসমূহকে পরিত্যাগ করতে এবং আমাদের বাব-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার মাধ্যমে আমাদের একতাকে ভেঙে তোহামা গোত্রের এই কুরাইশী ব্যক্তি (রসুলুল্লাহ) যা বলে তা মেনে নিতে? (3)

<# পরমত সহিষ্ণুতা #>

এসব কিছু পরও যদি কেউ দাবী করে রসুলুল্লাহ (ﷺ) পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন তবে সেটা কৌতুকসম হাস্যকর বৈ কি? অথচ তিনি নিজে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে,

أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ এবং আমিই বিনাশকারী আল্লাহ আমার মাধ্যমে কুফরীকে বিনাশ করবেন (4)

যাকে পাঠানোই হয়েছে কুফরীকে নিঃচিহ্ন ও নিঃশেষ করার জন্য তিনিই নাকি কুফরীর প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। বরফকে ফু দিয়ে ঠান্ডা করার মত কৌতুকতাপূর্ণ কথা বলতে যারা অভ্যস্ত তাদের জ্ঞান সম্পর্কে

(3) (ইবন কাছির কত্ব প্রণীত সিরাতে নববী)

(4) বুখারী কিতাবুল মানাকিব বাবু মা জাআ ফি আসমাই রসুলিল্লাহ ﷺ মুসলিম কিতাবুল ফাদাঈল বাবু মা জাআ ফি আসমাইহি ﷺ

যতটুকু করুনা হওয়া দরকার কোন মানুষের হৃদয়েই তত করুনা নেই। শুনেছি এসমস্ত মহা পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু দলীল আদিব্লা পেশ করা হয়ে থাকে।

<# “তোমার দ্বীন তোমার আমার দ্বীন আমার” কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা #>

এই যেমন ধরুন আল্লাহ বলেছেন

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

হে নবী ﷺ আপনি বলুন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

পণ্ডিতবর্গ এ আয়াতের অর্থ করে থাকেন এমন

তোমরা স্বাধীন ভাবে তোমাদের দ্বীন মেনে চলো আর আমাকে স্বাধীনভাবে আমার দ্বীন মানতে দাও।

এ আয়াত থেকে এধরনের সুক্ষ প্রমান বের করার দক্ষতাই প্রমান করে তাদের জ্ঞানের বহর কোন সাগরের তলদেশে অবস্থিত!

ধরুন একদিন সন্ধ্যায় আপনার একজন বন্ধু আপনাকে আবদার করে বলল

- চলো এখন গহরহাটির মেলা থেকে ঘুরে আসি।

আপনি ভাবলেন গহরহাটি বহুদূর, তাছাড়া গয়েষ পুরের মোড় পার হওয়ার পর থেকে আর কোন জনবসতি নেই। জিন ভুত যদি ছেড়েও দেয় চোর ডাকাত যে আক্রমণ করতে পারে তার সম্ভবনা প্রকট। দু একদিন অন্তর অন্তর সেধরনের খবরও আপনার কানে আসে। আপনি নিতান্ত মমতা মাখা কণ্ঠে বন্ধুকে সব ঘটনা খুলে বললেন কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বন্ধুর অসহনীয় পিড়াপিড়িতে বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে আপনি চিৎকার করে বললেন

- তোর কাজ তুই কর আমার কাজ আমি করি।

আপনার এই কথা শুনে যদি আপনার বন্ধু মনে করে আপনি তাকে গহরহাটির মেলা দেখতে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন তবে আপনার বন্ধুর মস্তিষ্কগত বিকৃতি কোন পর্যায়ে বলে আপনি মনে করেন?

এসকল পণ্ডিতরাও অনুরূপ বা ততোধিক বিকৃতির স্বীকার। রসুলুল্লাহ (ﷺ) নবুওয়াত পাওয়ার পর থেকে সমস্ত কাফিরদের প্রকাশ্য বা গোপনে একই কথা বলে আসছেন। বাপ-দাদার শিরক কুফরের ধর্ম পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার স্পষ্ট ও বিকল্পহীন দাওয়াতে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যায় করছেন। কিন্তু আবু জেহেল আবু লাহাবরা তার কথাই কর্নপাত না করে স্বীয় উপাস্যদিগকে নাছোড়বান্দার মত আকড়িয়ে পড়ে রয়েছে। এসংক্রান্ত বিবাদের কারনে মক্কার তথাকথিত শান্তি, অশান্তির দাবানলে পরিনত হয়েছে। বাবা-ছেলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহিত বিষম দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েছে। কোন ভাবেই এই আগুন নির্বাপিত হওয়ার সম্ভবনা তিরোহিত। না রসুলুল্লাহ (ﷺ) রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বে

অবহেলা করে শিরক কুফরের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে সামান্যতমও গাফেলতী করতে পারেন আর না মক্কার অহংকারী প্রভাব প্রতিপত্তিশীল নেতারা বিভ্রান্তির পচা ডোবা থেকে নিজেদের পরিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই অশান্তির নিরসনকল্পে মক্কার মুশরিকরা একটি অতিব চমৎকার সামাধান আবিষ্কার করে ফেলে। তারা পুরোমাত্রায় গনতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল। রসুলুল্লহ (ﷺ) এর আবির্ভাবের পর হতেই তারা তার সহিত গণতন্ত্র সম্মত আচরন করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রেও তাদের প্রস্তাবটি গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল ছিল। তারা যে প্রস্তাব পেশ করল তাফসীরে তাবারীতে তা এভাবে লেখা আছে

وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة، على أن يعبد نبي الله صلى الله عليه وسلم أهلهم
سنة (تفسير الطبري - (ج ٢٤/ص ٦٦١)

মুশরিকরা বলল আমরা একবছর আল্লাহর ইবাদত করব আর আপনি এক বছর আমাদের ইলাহসমূহের ইবাদত করবেন।^(৫)

একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখুন তো বহু বছর পর আব্রাহাম লিংকন বা অন্য কারও পক্ষ থেকে যে গনতন্ত্রের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা আবুজেহেলদের এই প্রস্তাবনা হতে ধার করা নই তো? যাই হোক আল্লাহ কিন্তু এধরনের গণতন্ত্র সম্মত আচরন পছন্দ করলেন না নিজের জমির মালিক কে হবে তা নিয়ে ভোটা ভোটি ভাগা ভাগি কেই বা পছন্দ করে? শুধু মালিক নই যিনি এই মহা বিশ্বের প্রতি ইঞ্চি মাটির সৃষ্টি কর্তা তার জমিনে তাকে ইবাদত করা হবে এটা অনস্বীকার্য বিষয়। এখানে কোনরূপ আপোষ বা তোশামদের সুযোগ নেই তার দাবি করাও বাতুলতা বৈ নয়। তাই কাফিরদের এই দাবির জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা কাফিরুন নাযিল করেন এবং বলে দেন তোমাদের দীন তোমাদের আর আমার দীন আমার। অর্থাৎ তোমরা শিরক ও কুফরের মধ্যে জীবনপাত করে জাহান্নামী হও আর আমাকে এক আল্লাহর ইবাদত করে জান্নাতী হতে দাও। যদি কেউ বলে এই আয়াতে শিরক কুফরকে মেনে নেওয়া হয়েছে তবে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে! অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন

أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران/ ৮০]

(নবীরা) কি তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর কুফরির আদেশ করবেন?

(সূরা আলে ইমরান/৮০)

কেউ কেউ মদিনার সনদের কথা তুলতে পারেন। তারা বলেন,

মদিনার সনদে যে, ইয়াহুদীদের নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তিনি

^(৫) তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবন কাছীর ও অন্যান্য তাফসীরে সূরা কাফিরুনের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(ﷺ) অন্য ধর্মের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন!

তাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসরত কাফিররা স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এটা তাদের অধিকার। তারা মনে করে মদিনার সনদ ও খোলাফায়ে রাশেদার কর্মনীতি থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমানিত হয়েছে।

<# অধিকার ও অনুমোদনের মধ্যে পার্থক্য #>

তুমি তড়িঘড়ি করে এদের উত্তর দিতে যেও না। অধিকার ও অনুমতির মধ্যে যে আলো আধারের সম্পর্ক পূর্বেই সে বিষয়ে ধারণা না দিলে তোমার উত্তরে ওদের রোগ আরোগ্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

- ধরুন নিজের গাটের টাকা খরচ করে যে বাড়িটি সদ্য কিনেছেন সেখানেই একজন অনাথকে কিছুকাল বসবাস করার অনুমতি দিলেন। অনাথটি এবং আপনি বাড়িটির বর্তমান বাসিন্দা। একবার চিন্তা করুন তো আপনি এবং অনাথটি উভয়েই বাড়িটিতে বসবাস করছেন কিন্তু উভয়েই কি বাড়িটিতে বসবাসের অধিকার রাখেন? অবশ্যই নই বরং আসল কথা এই যে, বাড়িটিতে বসবাসের বৈধ এবং সতন্ত্র অধিকার আপনারই আর সে আপনার অনুমতিতে বসবাস করে মাত্র। পার্থক্য এই যে অনাথটিকে আপনি যতদিন ইচ্ছা রাখবেন, প্রয়োজন হলে বিদায় করে দেবেন। যদি আপনার বাড়িতে বসবাস করার অধিকার তার থাকত তবে এমনটি করতে পারতেন না। করলে অন্যায় হতো। ঠিক যেমন অন্যায় হবে ভাই বা বোনকে ফাকি দিয়ে পিতার সম্পত্তির পুরো অংশটা নিজে ভোগ করলে। কারন আপনার অগ্রজ বা অনুজ আপনার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির বৈধ অধিকারী।

ইসলাম অমুসলিমদের কুফর বা শিরকের উপর স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার বৈধ অধিকারে বিশ্বাসী নয়। কখনও কখনও সময় বা সুযোগের প্রয়োজনে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালায় বেধে দেওয়া সীমা পর্যন্ত তাদের ধর্ম পালনের অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র। যেহেতু এটা নিছক অনুমতি, অধিকার নয় তাই যে কোন সময় ইসলাম তা বিলোপ সাধন করতে পারে।

<# জিজিয়া কর (الجزية) বলতে কি বোঝায়? #>

অনেকে এ বিষয়ে জিজিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারেন। তারা মনে করেন জিজিয়া গ্রহণ করে অমুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস ও নিজ নিজ ধর্ম পালনের যে অধিকার দেওয়া হয় সেটাই প্রমাণ করে ইসলাম কতটা সহিষ্ণু ধর্ম। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমাদের কথা পূর্ববতই হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস ও স্বীয় ধর্ম পালনের সুযোগ পাবে কিন্তু এটা তাদের অধিকার নয় আবার জিজিয়া অর্থও ধর্মীয় স্বাধীনতা নয়।

<# জিজিয়া অমুসলিমদের অধিকার নয় এটা স্থায়ী বিধানও নয়। #>

জিজিয়া কর গ্রহণ করে কুফরীর উপর টিকে থাকার সুযোগ দেওয়া যে কাফিরদের অধিকার নয় তার

প্রমাণ হলো জিজিয়া চিরন্তন বা স্থায়ী কোনো বিধান নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তাদের এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন যখন ইচ্ছা করবেন আবার বঞ্চিত করবেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পূর্বে এধরনের ব্যবস্থা ছিলনা কারন তখন গনিমাত বৈধ ছিল না। তাই আমরা দেখি সুলাইমান (عليه السلام) যখন বিলকিসকে চিঠি লিখে মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন তখন বিলকিস উপটোকন হিসাবে বহু সম্পদ পাঠিয়েও নিস্তার পায়নি।⁽⁶⁾ একইভাবে যুল কারনাইন যখন বিশ্বময় ভ্রমনের মাঝে এমন এক এলাকাতে পৌঁছালেন যেখানে একটি সম্প্রদায়কে দেখলেন আল্লাহ (ﷻ) বললেন

ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا [الكهف/٨٦-٨٨]

তুমি ইচ্ছা করলে এই জাতিকে শাস্তি দিতে পারো অথবা তাদের সহিত ভাল আচরন করতে পারো। তিনি বললেন, যে জুলম (কুফর ও শিরক) করবে তাকে আমি শাস্তি দেব এবং সে তার রবের নিকট ফিরে গেলে আরও বেশি শাস্তি পাবে। আর যে ঈমান আনবে ও সৎ কর্ম করবে আমি তার সহিত ভাল আচরন করব। (কাহফ/৬৬-৬৮)

সুতরাং পূর্বে কাফিরদের জন্য জিজিয়া কর প্রদান করে ধর্ম পালনের সুযোগ ছিল না। তখন তাদের জন্য দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল ইসলাম কবুল করা অথবা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়া। যখন ইসা (عليه السلام) আসবেন তিনিও ইসলাম ছাড়া কোন কিছুই গ্রহন করবেন না এবং পৃথিবীর উপর কোন কাফিরকে বিচরনশীল অবস্থায় ছেড়ে যাবেন না। সমস্ত কাফিরকে হয় তো ধংস হয়ে যেতে হবে নইতো ইসলাম কবুল করতে হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন

ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية

শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ইসা ইবন মারইয়াম (عليه السلام) একজন ন্যায় পরায়ন শাসক হিসাবে নাযিল হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, গুরুর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া কর গ্রহন করবেন না।⁽⁷⁾

জিজিয় গ্রহন করবেন না এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম নাব্বী বলেন

وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ويضع الجزية) فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار الا الاسلام—مو
بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل الا الاسلام أو القتل

আল্লাহর রসুল (ﷺ) যে বলেছেন তিনি জিজিয়া গ্রহন করবেন না এর সঠিক অর্থ হল তিনি কাফিরদের

⁽⁶⁾ সূরা নামল ২০ থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত বিশেষ করে ৩৫ ও ৩৬ নং আয়াত

⁽⁷⁾ বুখারী ও মুসলিম

নিকট হতে ইসলাম গ্রহন ভিন্ন অন্য কিছুতেই সম্ভব হবেন না। কাফিররা জিজিয়া দিতে রাজী হলেও রক্ষা পাবে না বরং হয় তো মুসলিম হতে হবে নয়তো নিহত হতে হবে।^(৪)

বর্তমানেও কোন কোন ইমামের মতে কোন কোন প্রকারের অমুসলিমদের নিকট জিজিয়া নেওয়া হবে না নিম্নে এ বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মত উল্লেখ করা হল

১ . হাম্বলী মাযহাবের মতে আহলে কিতাব ও মাজুসী (অগ্নিপূজক) ছাড়া অন্য কোন কাফির সম্প্রদায় হতে জিজিয়া গ্রহন করা হবে না।

ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عاهدوا عليه ومن سواهم لا—سلافاً أو القتل

ইয়াহুদী খৃষ্টান এবং মাজুসী ছাড়া অন্য কোন কাফিরদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহন করা হবে না। এবং জিজিয়া নেওয়া হবে যখন তারা মুকিম অবস্থায় থাকবে (সফর অবস্থায় নই) এরা ছাড়া অন্য কাফিরদের ইসলাম গ্রহন বা হত্যা হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।^(৫)

২ . শাফেয়ী মাযহাবেরও একই মত

ولا تؤخذ الجزية من أهل الاوثان ولا ممن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب

মূর্তি পূজারী বা মন যা চায় তার ইবাদত করে এমন ব্যক্তি যদি আহলে কিতাব না হয় তবে তার নিকট হতে জিজিয়া গ্রহন করা হবে না।^(৬)

৩ . হানাফী মাযহাবের মতে আরব মুশরিক এবং কুরাইশ কাফিরদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহন করা হবে না

وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الجيوش ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص وهذا في حق في تقبل منه الجزية ومن لا تقبل منه كالمتردين وعبداء الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية لأنه لا يقبل منهم إلا الاسلام

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন যদি তারা ইসলাম গ্রহন করতে অস্বীকার করে তবে তাদের জিজিয়া আদায়ের প্রস্তাব দাও তিনি (ﷺ) সেনাবাহিনীর আমীরদের এই আদেশ দিতেন কারন জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমেও

(৪) ইমাম নাব্বী কৃত মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা

(৫) মুখতাসারুল খিরকী। ইবনে কুদামার লিখিত আলমুগনী দ্রষ্টব্য সেখানে তিনি এমতের পক্ষে বিভিন্ন দলীল পেশ করেছেন যা খুবই চমৎকার ও শক্তিশালী বর্তমান গ্রন্থে তা উল্লেখ করা বাহুল্য বিবেচ্য হওয়ায় আমরা তা উল্লেখ করছি না।

(৬) মুখতাসারুল মুব্বনী

যুদ্ধ শেষ হতে পারে এটা স্পষ্ট বিষয় কিন্তু এটা কেবল ঐ সমস্ত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের নিকট জিজিয়া গ্রহণ করা হবে। যাদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা হবেনা তাদের জিজিয়া আদায়ের দিকে ডাকার প্রশ্নই আসে না যেমন মুরতাদ বা আরব মুশরিকরা কেননা এদের নিকট হতে ইসলাম ছাড়া কিছুই কবুল করা হবে না।

(হিদাইয়া)

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ مِنَ الْقُرَشِيِّ

কুরাইশ কাফিরের নিকট হতে জিজিয়া ও খারাজ গ্রহণ করা হবে না।

৪ . চার ইমামের মধ্যে কেবল ইমাম মালিকের মত হলো সকল কাফিরদের নিকট হতে জিজিয়া কর গ্রহণ করা হবে।⁽¹¹⁾

তবে কুরাইশী কাফিরের ব্যাপারে মালিকী মাযাহাবেও দ্বিমত রয়েছে। ইবনে রুশদ ও অন্যান্য কিছু আলেম বলেছেন কুরাইশ কাফিরের নিকট জিজিয়া গ্রহণ না করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন।

ইবনে রুশদ বলেন,

بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي

কারো কারো বর্ণনা মতে কুরাইশী ব্যক্তি আহলে কিতাব হলেও তার নিকট জিজিয়া গ্রহণ না করার ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন।

(বিদায়াতুল মুজতাহিদ)

মালেকী মাযাহাবের আলেম আলী আবুল হাসান বলেন,

فَالْقُرَشِيُّ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا

কুরাইশ কাফিরের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ না করার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

(শরহে কাফিয়া)

তাছাড়া কোনো মুরতাদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ না করার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। যে ব্যক্তি পূর্বে কালেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলিম হয়েছিল বা মুসলিম বাবা মায়ের গুঁরষে জন্ম গ্রহণ

(11) আল মুদাওওয়ানা

করেছিল বা না বালগ অবস্থায় মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল এই সকল ব্যক্তি দের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না তাদের নিকট হতে জিজিয়াও গ্রহণ করা হবে না বরং তাদের হয়তো মুসলিম হতে হবে নয়তো হত্যা করা হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

من بدل دينة فاقتلوه

যে দ্বীন পরিবর্তন করে (মুসলিম হওয়ার পর কাফির হয়ে যায়) তাকে হত্যা করো।

(বুখারী)

সুতরাং বর্তমানেও কোনো কোনো কাফিরের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে আবার কারো নিকট হতে গ্রহণ করা হচ্ছেনা। তাদের জন্য মুসলিম হওয়া বা নিহত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ নেই। যদি জিজিয়া গ্রহণ করে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা প্রদান করা ইসলামে বিধর্মীদের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হতো তবে সর্বাবস্থায়ই তা মেনে চলা হতো ব্যক্তি ও সময়ের পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অবলম্বন করা হতো না। আসল কথা হলো ইসলাম কখনও কখনও জিজিয়া গ্রহণ করে বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাফিরদের তাদের নিজ ধর্ম পালন করার সুযোগ দেয় এটা সত্য কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা মনে করে কাফিরদের স্থায়ী ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে যা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। বরং এটা ইসলামের পক্ষ হতে কাফিরদের সাময়িকভাবে অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র। যদি এটা তাদের অধিকার হত তবে সর্বযুগে এবং সকল কাফিরদের ক্ষেত্রে তা বহাল রাখতে হত। না রাখলে অন্যায় হত। কিন্তু ইসলাম প্রয়োজন অনুসারে তাদের অনুমতি দেয় প্রয়োজন হলে বাধা আরোপ করে। যেমনটা পূর্ববর্তী শরীয়তে ছিল এবং ইসা (عليه السلام) অবতীর্ণ হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে। এবং বর্তমানেও যার সম্ভাবনা পুরোপুরি তিরোহিত নই। যদি মুসলিম জাহানের খলীফা ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর (রঃ) মত গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী আহলে কিতাব ও মাজুসী ছাড়া সকল কাফিরদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তবে পুরো মুসলিম উম্মাহ তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধদের হয়তো নিহত হতে হবে নয়তো ইসলাম কবুল করতে হবে। আর এটা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়ও হবে না পাপের কাজও হবে না কারন একদল গ্রহণযোগ্য মুজতাহিদ যে মত দিয়েছেন তা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পরবর্তী মুসলিমদের রয়েছে।

<# জিজিয়া গ্রহণ করা অর্থ বিধর্মীদের স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেওয়া নয়। #>

যাদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে তাদের ধর্মকে সম্মান করা হচ্ছে বা কুফর ও শিরকের জয়গান গাওয়া হচ্ছে ঘটনাটা তেমনও নই। বরং আল্লাহর রসুল (ﷺ) কুফর শিরক বিনাশ করার যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন তারই অন্য একটি পন্থা হল এই জিজিয়া। কথায় বলে কেউ কিলে মরে কেউ কোলে মরে। যেখানে যেমন পদ্ধতি কার্যকর সেটা প্রয়োগ করে কুফরীকে ধ্বংস করার জন্যেই মূলত

একদিকে তরবারী অন্য দিকে জিজিয়া করার ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র নিজেদের বাতিল ধর্ম বিশ্বাসের জন্য জিজিয়া করার বোঝা ও সাজা ভোগ যে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের রাস্তা খুলে দেবে শরীয়ত প্রণেতা তা জানতেন। শুধু মাত্র এ কারনেই এ ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। কুফরীকে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নয়।

আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেছে তাওহীদের স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করব অথচ জিজিয়া গ্রহণ করেই যুদ্ধে বিরতি দেওয়া হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের জবাবে ইবন হাযার আল আসকালানী (রঃ) বলেন,

أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا أحسن

বলা যায় জিজিয়া গ্রহণ করার উদ্দেশ্যই হল ক্রমে ক্রমে কাফিরদের ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে আসা যেহেতু জিজিয়া কর অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কারন হয় তাই জিজিয়া দিতে সম্মত হওয়াটাও ইসলামকে মেনে নেওয়ারই সমতুল্য তাই হাদীসের অর্থ তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা মুসলিম হয়ে যায় অথবা এমন কিছু করতে রাজী হয় যা তাদের আন্তে আন্তে ইসলামের দিকেই নিয়ে আসবে। এই উত্তরটিই সর্বোত্তম।⁽¹²⁾

জিজিয়া কর দেওয়ার পর কাফিররা নিজেদের ইচ্ছামতো স্বাধিনভাবে ধর্ম পালন করবে কথাটাও মিথ্যা। যে আয়াতে জিজিয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে সেই আয়াতটির উপর চিন্তা গবেষণা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة/ ٢٩]

আহলে কিতাবীদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ (ﷻ) ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করেনা এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করে।⁽¹³⁾

যে সকল চিন্তাবিদরা জিজিয়াকে ধর্মীয় স্বাধিনতা হিসাবে কল্পনা করেন তারা আয়াতটির শেষের অংশ হতে সম্পূর্ণ বেখবর। আল্লাহ কেবল জিজিয়া গ্রহণ করতে আদেশ করেননি সেই সাথে অপমানিত

(12) ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী

(13) সুরা তাওবা / ২৯

অবস্থায় (هو نورغاص) কথাটুকু যোগ করার মাধ্যমে জিজিয়ার স্বরূপ কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান সংক্রান্ত আলোচনাতে ইবনে কাছির (রঃ) বলেন

أي: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صَغَرَة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهودي را—صنـداو بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة

অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া কর দেওয়ার অর্থ তারা (ইসলামী রাষ্ট্রে) তুচ্ছ, নগন্য ও হেয় অবস্থায় থাকবে একারণে জিম্মীদের সম্মান করা অথবা মুসলিমদের উপরে স্থান দেওয়া জায়েজ নয় বরং তারা থাকবে অপমানিত, লাঞ্চিত ও হতভাগ্য অবস্থায় যেমনটি মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েতে এসেছে হযরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বলেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন তোমরা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের আগে সালাম দিওনা আর যখন তাদের সাথে রাস্তায় দেখা হয় তখন তাদের একপাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করো⁽¹⁴⁾ একারণে উমর ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) শামের ইয়াহুদীদের সহিত সেইসব চুক্তি করেছিলেন যা সর্বজন বিদিত⁽¹⁵⁾

এরপর তিনি সেই লম্বা চুক্তিটি সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছেন আমরা তার কিছু অংশ উল্লেখ করবো

ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوفر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس

(ইয়াহুদীরা চুক্তিতে লিখেছিল) আমরা আমাদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করবোনা আর শিরক কুফরের দিকে কাউকে ডাকবোনা আর আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যে কেউ মুসলিম হতে চায় আমরা তাকে বাধা দেব না। আর এও যে, আমরা মুসলিমদের সম্মান করবো যদি তারা আমাদের মজলিসে বসতে চায় আমরা উঠে যেয়ে তাদের স্থান করে দেব।⁽¹⁶⁾

তারিখে ইবনে খলদুনের বর্ণনায় এধরনের কথায় আছে তবে (لا نظهر شركا) আমরা শিরক কুফর প্রকাশ্যে পালন করব না এ স্থলে (ولا نهظن لمنعر—ش) আমরা আমাদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করব না এমন বলা আছে।

(14) মুসলিম কিতাবুসসালাম বাবুন নাহই আন ইবতিদায়ি আহলিল কিতাব বিসসালাম

(15) ইবনে কাসির জিজিয়ার আয়াতের ব্যাখ্যায়

(16) ইবনে কাছির জিজিয়ার আয়াতের ব্যাখ্যায়, মুখতাসার তারিখি দামেশক ইবনে মানযুর, তারিখে ইবনে খলদুন

ইবনে কায়্যিম আহকামু আহলিল জিম্মা আর ইবনে মানযুর মুখতাসার তারিখে দেমেশক এ উল্লেখ করেছেন,

ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا

আমরা আমাদের দ্বীনের দিকে কাউকে উৎসাহিত করব না এবং কাউকে সেদিকে ডাকবো না (আমাদের দ্বীনের প্রচার করব না)

ইবন তাইমিয়া বলেন

بَلْ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ وَسَائِرُ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُظْهِرُوا أَعْيَادَهُمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَهَا سِرًّا فِي مَسَاكِينِهِمْ

অমুসলিম যিম্মিদের উপর উমর ইবন আল খাত্তাব, অন্যান্য সাহাবারা এবং মুসলিমদের সমস্ত খলীফারা এই শর্ত করতেন যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের ধর্মীয় উৎসব সমূহ প্রকাশ্যে পালন করতে পারবে না বরং তাদের বাড়িতে গোপনে পালন করবে। (মাজমুউল ফাতাই)

উমর (رضي الله عنه) জিম্মিদের নিজস্ব এইসব শর্ত নিয়েছিলেন এবং এটাই সত্যপন্থি মুসলিম খলীফাদের নীতি ছিল আফসোস যে দেড় হাজার বছর পর উমর (رضي الله عنه) সহ সকল খলীফাকে গনতান্ত্রিক বলা হচ্ছে। যদি তারা এই জঘন্য অপবাদ শুনতেন তবে নিশ্চয় ক্রোধ ও অপমানে মুর্ছা যেতেন।

<# কাউকে ক্ষমা করা বা সুযোগ দেওয়া অর্থ তাকে মেনে নেওয়া নয় #>

অনেকে আছেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) কবে কোথায় কোন কাফিরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সেটা মুখস্থ করে কেবল সেগুলোর উপর ওয়াজ নসীহত করেন। তারা মূলত মার্জনার সাথে মেনে নেওয়ার যে সুবিশাল পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ গফিল।

আমরা সর্বদায় শিরক কুফর ও সকল প্রকার মানব সৃষ্ট মতবাদের ধ্বংস চাই। যখন প্রকাশ্য ময়দানে মুখোমুখি হয়ে কাফিরদের সহিত রক্ত আদান প্রদান করি তা যেমন বাতিল শক্তিকে নিঃশেষ ও নিঃচিহ্ন করার উদ্দেশ্যে অনুরূপই বাতিল পন্থিদের উপর আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ক্ষমাও তাদের ধর্মের প্রতি আমাদের সহিষ্ণু মনোভাবের প্রমাণ বহন করে না। বরং আমরা তাদের ক্ষমা করি যাতে তারা ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসে, যাতে তারা জাহান্নামের অতল গহ্বর হতে রক্ষা পায়। আমাদের এই উত্তমুখী আক্রমণ শয়তানী মতবাদ সমূহের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। আমাদের শানিত তরবারীর পরিমিত আঘাত যেমন কুফরী শক্তির হস্ত ও দস্ত কর্তন করে তেমনি আমাদের তরুসম কমল অন্তরের ছায়ায় শত পরিশ্রান্ত মানুষ শীতল হয়। আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের এই আচারন শিক্ষা দিয়েছেন।

তায়েফের কঠিন সেই দিনটির কথা কত শত ক্রন্দনরত বক্তার মুখে শুনেছেন! অল্প সময়ের ব্যবধানে

চাচা আবুতালেব ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদেজা (رضي الله عنها) এর মৃত্যু শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই মহান রবের দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) হাজীর হয়েছিলেন তায়েফে। তায়েফের লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ করেনি কেবল এতটুকু হলেও কষ্ট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হত। উপরন্তু তারা ছোট ছোট বাচ্চাদের লেলিয়ে দিল। আবুবা বাচ্চারা পাথর ছুড়ে রব্বুল আলামিনের দূতকে রক্তাক্ত করল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাগান্বিত হলেন তিনি পাহাড়ের ফেরেস্তাকে পাঠালেন তায়েফ বাসীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য। পাহাড়ের ফেরেস্তা বলল আপনি চাইলে আমি তাদের দুই পাহাড়ের মাঝে পিষ্ট করতে পারি। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا

আমি তো আশা করি তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন কেউ জন্মাবে যে কোন শরীক ছাড়ায় এক আল্লাহর ইবাদত করবে।⁽¹⁷⁾

আমরা বলি রসুলুল্লাহ (ﷺ) ক্ষমা করেছেন।

কিন্তু তিনি কেন ক্ষমা করেছেন?

যাতে এসকল শাস্তি উপযুক্ত নরাধমদের ঔরষে তাওহীদের ফুল ফোটে। যাতে এক আল্লাহকে ইবাদত করা হয় এবং অন্য সমস্ত উপাস্য পরিত্যক্ত হয়।

এই সুক্ষ বিষয়টি এমন অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী নন। তারা সর্বদায় ক্ষমা ও অনুকম্পাকে মেনে নেওয়া ও পছন্দ করার সাথে তুলনা করেন। হাজী মোঃ মহাসীন যে চোরকে পাকড়াও করার পর বাড়তি কিছু দান করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন তা চুরির প্রতি সমর্থন বলে গণ্য হবে না। তার দানকৃত টাকাও চুরিকর্মের পুরস্কার স্বরূপ নয় বরং চোরকে চুরি থেকে ফিরানোই তার উদ্দেশ্য ছিল। চুরির প্রতি তার ঘৃণা আপনার চেয়ে বেশি না হলেও কম ছিল না নিশ্চয়।

মোট কথা মুসলিমরা কুফর ও কাফিরদের সর্বদায় ঘৃণা করে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

[الحجرات/৭]

নিশ্চয় আল্লাহ (ﷻ) তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা শোভনীয় করে দিয়েছেন আর তোমাদের নিকট ঘৃণিত করে দিয়েছেন কুফর, ফিসক ও পাপ কাজকে। এরাই সত্যপথ প্রাপ্ত।

(সূরা হুজুরাত/৮)

(17) বুখারী ও মুসলিম

<# মদীনার সনদ #>

মদীনার সনদে ইয়াহুদীদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাদের স্বীয় ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা নিতান্তই সীমিত ও অনুমতি সাপেক্ষ। মদিনার সনদেরই অন্য একটি ধারা এমন

وَإِنَّكُمْ مِنْهُمْ لَخِلَفَةٌ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমরা যে বিষয়েই মতপার্থক্য কর না কেন তা আল্লাহ এবং তার রসুলের ﷺ দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।⁽¹⁸⁾

আলী মুহাম্মদ মুহাম্মদ আসসালাবী বলেন ,

والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعاً لقيلمها بالارطضا في الداخل من جراء تعدد السلطات، وفي نفس الوقت تأكيد ضميني برئاسة الرسول صلى الله عليه وسلم على الدولة

এই ধারাটির সারমর্ম খুবই স্পষ্ট আর তা হল একটি সর্বোচ্চ কতৃত্বশীলের কতৃত্ব নিশ্চিত করা যিনি মদিনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। মদিনাতে সংঘটিত যে কোন বিবাদের মিমাত্সা সেই সর্বোচ্চ কতৃত্বশীলের মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে। যাতে করে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একাধিক ক্ষমতাশীলের অস্তিত্ব জনিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। একইভাবে এই ধারাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে নবগঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।⁽¹⁹⁾

সুতরাং মদিনার রাষ্ট্রপতি কে হবে কোন ইয়াহুদীকে সে বিষয়ে কোনরূপ ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি বরং রসুলুল্লাহ (ﷺ) একতরফাভাবে সে ঘোষণা দিয়েছেন। যদি সেদিন ইয়াহুদীরা দাবী করত মদিনার শাসনকর্তা কে হবে সে বিষয়ে আমাদের ভোট নেওয়া হোক তবে আবু বকর উমর বা সাদ ইবন মায়াজ এর মত সাহাবারা কেমন আচরণ করতেন? তারা কি বর্তমান পণ্ডিতবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজেদের দ্বীন ঈমান কোরবানী দিতেন? (নাউযু বিল্লাহ)

যদি সত্যিই সেদিন এমন কিছু হতো তবে ইয়াহুদীরাই জয়ী হতো কারণ তারা ছিল রসুলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি তীব্র হিংসুক এবং সংখ্যায় মুসলিমদের কয়েকগুন।

মদীনার সনদে ইয়াহুদীদের নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এথেকেই যারা ইসলামে গনতন্ত্রের উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ পেশ করেন তারা এসব ভুলে যান। তারা আরও ভুলে যান যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

(18) ইবন হিশাম , আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া

(19) আস সিরাতু আননাবাবিইয়াতু আরদু ওয়াকিইন

لَا أُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ حَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا

অবশ্যই আমি আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বহিষ্কৃত করব। এখানে আমি মুসলিম ছাড়া কাউকে থাকতে দেবনা।⁽²⁰⁾

ইবন আল হাযার বলেন,

قال الطبري فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة

আততাবারী বলেছেন যে এলাকা মুসলিমরা যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক দখল করে সেখান হতে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মলব্ধদের বের করে দেওয়ার অধিকার খলীফার রয়েছে।⁽²¹⁾

কথা একটিই যে, মদিনার সনদে ইয়াহুদীদের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বা জিজিয়া করের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজারা যতটুকু সুবিধা পেয়ে থাকে তার অর্থ তাদের ধর্ম ও মতকে সম্মান প্রদর্শন নয় এসব তাদের প্রাপ্য অধিকারও নই। বরং এটা মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি করুণা মাত্র। আল্লাহ যতটুকু করুণা করতে বলেছেন তারা ততটুকু করুণা পাবে আর আল্লাহ যতটুকু কঠোর হতে বলেছেন তারা ততটুকু কঠোরতার সম্মুখীন হবে। একজন মুসলিম আল্লাহর দেওয়া বিধান ছাড়া অন্য কোন মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয় না।

<# মানবতা ও গণতন্ত্রের স্লোগান তুলে ইসলাম হতে মানুষকে ফিরানোর চেষ্টা #>

কাফিররা বলে, এটা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এতে মানবতা ভুলঠিত হচ্ছে।

এভাবে তারা মুসলিমদের আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নাযিলকরা ধর্ম আল ইসলাম হতে ফেরানোর চেষ্টা করে।

মনে রাখতে হবে এধরনের চাতুর্যাতাপূর্ণ স্লোগান রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায়ও ধ্বনিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন যখন মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করল তখন কাফিররা মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলল ,

أَتَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُمْ وَلَا تَأْكُلُونَ مَا قَتَلَ اللَّهُ ؟

তোমরা নিজেরা যেটাকে হত্যা কর তার মাংস খাও আর আল্লাহ যেটাকে হত্যা করেন তার মাংস খাওনা
এটা কেমন কথা?

সম্ভবত এধরনের চমৎকার যুক্তি কাউকে কাউকে প্রভাবিত করেছিল। যেকারণে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া

⁽²⁰⁾ (বুখারী ও মুসলিম উপরক্ত ইবারতটি মুসলিম কত্বক বর্ণিত)

⁽²¹⁾ ফাতহুল বারী

তায়াল্লা স্পষ্ট সতর্কবানী নাযিল করলে ।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [الأنعام/ ১২১]

অবশ্যই তোমরা খাবেনা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি এমন পশুর মাংস এটা খাওয়া পাপ আর শয়তানরা মানুষের মধ্য হতে যারা তাদের বন্ধু তাদের নিকট ওহী করে যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় । যদি তোমরা তাদের মেনে নাও তবে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে ।^(২২)

বর্তমানেও মানবতার নামে ইসলামের দাসপ্রথা, রজম, ইত্যাদি বিধানকে সমালোচনা করা হচ্ছে । গনতন্ত্রের নামে জিহাদ কিতালকে বাতিল ঘোষণা করা হচ্ছে । যদি তাদের বিরতিহীন প্রচারে কারও মতিভ্রম ঘটে থাকে তাকে বলব, ইসলাম তাই যা আসমানী ওহীর মাধ্যমে আমাদের শেখানো হয়েছে । কোরআন হাদীস যা বলে যদি কারও তা পছন্দ না হয় তবে ইসলাম থেকে বের হয়ে অন্য যে কোন মত ও পথ ধরতে পারেন কিন্তু দয়া করে কাফির মুশরিকদের কাছে মুখ রাখার নিমিটে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিতে যাবেন না ।

যে সমস্ত মুসলিম পন্ডিতেরা গনতন্ত্রের জয়গানে আবিভূত ও পরাজিত মানসিকতা নিয়ে ইসলামের রাষ্ট্রনীতি ও খোলাফায়ে রাশেদার কর্মপন্থাকে গনতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করে মান বাচানোর চেষ্টা করছেন তাদের প্রশ্ন করি ।

- অমুসলিম প্রজাদের নিকট হতে অপমানিত^(২৩) অবস্থায় কর নেওয়া, তাদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ হতে বঞ্চিত রাখা,^(২৪) মদিনার সনদে একতরফাভাবে রাষ্ট্রনায়ক ও সর্বোচ্চ কত্বের

(২২) আনআম - ১২১

(২৩) জিজিয়ার আয়াতেই অপমানিত (هو نور غاصد) শব্দটির উল্লেখ আছে যদিও তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদেরা আয়াতটির অনুবাদ করার সময় বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে চলেন । তাই অনুরোধ করব নিজে একবার সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতটির তরজমা দেখে নিন ।

(২৪) বর্ণিত আছে আবু মুসা আল আশআরী কাতের পদে একজন খৃষ্টানকে নিয়োগ দিলে হযরত উমর রাঃ আবু মুসা রাঃ কে তিরস্কার করলেন এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধু গ্রহন না করা সম্পর্কিত সূরা মায়েরদার আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন । (আলকুরতুবী)

ইবনে কাসিয়ম ইসলামী রাষ্ট্রে কাফির জিম্মীদের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করার অবৈধতা সম্পর্কিত আলোচনাতে বলেন

ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من توليتهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً والولاية صلة فلا تجتمع معاداة الكافر أبداً
যেহেতু তাদের কোন পদ দেওয়া অর্থ তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহন করা তাই তাদের পদ দেওয়া অর্থ তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহন করা অথচ আল্লাহ বলেছেন যে কেউ তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহন করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে আর তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না তাদের সাথে বন্ধুত্ব করাটা সম্পর্কহেদের বিপরীত অতএব বন্ধুত্ব আর

ঘোষণা দেওয়া, জাজিরাতুল আরব থেকে ইয়াহুদী খৃষ্টান সহ সকল ভিন্ন ধর্মালম্বিদের বহিষ্কার করা এসব কোন ধরনের গনতান্ত্রিক আচারন? যে রাষ্ট্রে মুসলিমরা প্রত্যহ পাচবার উচ্চ স্বরে আযান দিয়ে নিজেদের ধর্ম পালন করে সেখানে কাফিরদের প্রকাশ্যে স্বীয় ধর্ম পালন করতে দেওয়া হবে না, মুসলিমরা তাদের ধর্ম প্রচার করবে কাফিররা তা করতে পারবে না। কোনো ভাবেই এগুলোর গণতন্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেন কি? নাকি এর সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেন?

<# রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদা কি গনতান্ত্রিক ছিলেন? #>

যারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও তার পরবর্তী সত্যপন্থী খুলাফায়ে রাশেদাকে গনতান্ত্রিক বলে প্রচার করেন তারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ও তার পিয়ভাজন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অপবাদ দেওয়ার দোষে দুষ্ট। আমরা পূর্বে যা কিছু বর্ণনা করেছি তা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বা খোলাফায়ে রাশেদা পরিপূর্ণভাবে অগনতান্ত্রিক ছিলেন। ইসলামকে অগনতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করতে অনেকের দ্বিধা হয় কারন পাশ্চাত্য প্রভুরা শব্দটাকে গালি হিসাবে ব্যবহার করে। আমরা কিন্তু হলফ করে বলতে পারি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং তার চার খলীফা (রাঃ) পুরোমাত্রায় অগনতান্ত্রিক ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী সময়ে যত খলীফা এবং সুলতান মুসলিমদের উপর শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের সকলেই গণতন্ত্র হতে নিরাপদ দূরত্বেই ছিলেন। এমনকি নিকট অতীতের মোগোল সম্রাটরাও এধরণের উদ্ভট নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আমার যতদূর জানা আছে কেবল সম্রাট আকবার পুরোমাত্রায় গনতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলো। হিন্দু মুসলিমদের কেবল সম অধিকারই নয় বরং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বিধর্মীদের নিয়োগ দেওয়া, সকল ধর্মের সমন্বয়ে দ্বীনে ইলাহী নামে একটি ধর্ম সৃষ্টি করা, নিজে হিন্দু ধর্মলম্বী মেয়েদের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা ইত্যাদি নেককারজনক কাজ করে উক্ত শাসক নিজেকে সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক প্রমাণ করে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু আখিরাতে তার এই সকল কাজের হিসাব যে কতো ভারি তা জ্ঞান সম্পন্ন কারো নিকট অজানা থাকার কথা নয়। সুতরাং নিজেকে গনতান্ত্রিক প্রমাণ করার লক্ষে আকবারের মতো দ্বীন ঈমান বিসর্জন দিতে যারা প্রস্তুত আছেন তারা এখনই কাজে নেমে পড়তে পারেন কিন্তু আমরা আমাদের দ্বীন ঈমান নিয়েই সম্ভুষ্ট আছি, থাকবো। আমরা নিজেদের অগনতান্ত্রিক বলেই পরিচয় দিই। এতে আমাদের গলা কাপেনা কারন কাফিররা যা গালি হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের নিকট বহুক্ষেত্রেই তা উপাধী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর রসুলের এই কথাটির ব্যাপারেই একটু চিন্তা করুন

أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر وني الرحمة وني الملحمة

সম্পর্কহীন কখনই একত্রিত হতে পারে না আর তাদের কে (পদ দেওয়ার মাধ্যমে) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তাদের সম্মান দেওয়া হচ্ছে (অথচ আল্লাহ তাদের অপমানিত করতে বলেছেন) সম্মান দেওয়া আর অপমানিত করা এক হতে পারে না। বন্ধুত্ব করা অর্থ সম্পর্ক কর (অথচ কাফিরদের সাথে শত্রুতা করতে বলা হয়েছে) বন্ধুত্ব আর শত্রুতা একই সাথে হতে পারে না। (আহকামু আহলিল জিম্মা)

আমি মুহাম্মদ আমি আহমদ আমি পরে আগমন কারী আমি সংঘবদ্ধ কারী আমি রহমতের নবী আমি যুদ্ধবাজ নবী।⁽²⁵⁾

হাদীসের যে অংশটুকুর অর্থ যুদ্ধবাজ নবী তার ব্যাখ্যায় ইবন আল আছীর বলেন,

ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام [نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ] يعني نَبِيُّ الْقِتَالِ وهو كقوله الآخر [بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ]

রসুলুল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে একটি হল (নাবিয়্যুল মালহামাহ) এর অর্থ হল যুদ্ধের নবী এটা অন্য আর একটি হাদীসের অনুরূপ যেখানে বলা হয়েছে আমাকে তরবারী সহ পাঠানো হয়েছে।⁽²⁶⁾

ফার্সি ভাষায় যুদ্ধ কে (جنگ) জঙ্গ বলা হয় আর যুদ্ধবাজ বলতে জঙ্গী (جنگي) শব্দ ব্যবহার করা হয় সোজা অর্থে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন আমি জঙ্গী নবী স্বয়ং রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজের জন্য যে উপাধী ব্যবহার করেছেন সেটা কাফিররা গালি হিসাবে ব্যবহার করলেই পরিত্যাগ করতে হবে এ নীতি যে সাগরের তলদেশ থেকেই আহরীত হোক আমাদের নিকট তা পরিত্যক্ত আবর্জনার মত বর্জনযোগ্য। সেকারনেই তো আমরা আমাদের বীর নেতাদের জঙ্গী উপাধিতে ডাকি যেমন বলা হয় নুরুদ্দীন জঙ্গী। তোমাকে কেউ জঙ্গী বলে সম্বোধন করলে খুশি হও। সম্ভব হলে তাকে কিছু উপহারও দিও। এর চেয়ে বড় আনন্দের সংবাদ আর কি আছে! তুমি যে রসুলকে নিজের প্রানের চেয়েও বেশি ভালবাস, স্বপ্নে হলেও যাকে একবার দেখার জন্য তোমার প্রান উদ্ভিগ্ন তিনি নিজে নিজের জন্য যে উপাধি ব্যবহার করেছেন তোমাকে সেই উপাধিতে ডাকা হচ্ছে এ সৌভাগ্য তো অনেকে চেয়েও পায়নি।

<# অগনতান্ত্রিক আচরণের দলীল প্রমাণ #>

আমরা আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি কাফিরদের সহিত গণতন্ত্র সম্মত আচরন করা, তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধিনভাবে পালনের অধিকার স্বীকার করা বা আল্লাহর জমিনে আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নবী রাসুলরা আগমন করেননি। খোলাফায়ে রাশেদাও আব্রাহাম লিঙ্কনের দেওয়া এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য সদা সতর্ক ছিলেন ব্যাপারটি তেমন নই। বরং কুফর ও কাফিরদের সমুদে ধংস করার জন্যই যুগে যুগে নবীদের আগমন ঘটেছে।

<# এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কিছু কথা #>

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر (صحيح البخاري - ج ٣/ص ١٢٩٩)

⁽²⁵⁾ মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবন হিব্বান শুআইব আল আরনাউত সহীহ বলেছেন এবং হাকেম তার মুসনাদটিকে উল্লেখ পূর্বক বলেছেন এই হাদীসটির সনদ সহীহ আজজাহাবী তার তালখীসে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।

⁽²⁶⁾ আননিহাইয়া ফি গরীবিল আছার

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ এবং আমিই বিনাশকারী আল্লাহ আমার মাধ্যমে কুফরীকে বিনাশ করবেন (27)

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা স্বীকার করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (অর্থাৎ মুসলিম হয়ে যাবে) যখন তারা তা স্বীকার করবে তাদের সম্পদ ও রক্ত আমার নিকট রক্ষিত বিবেচিত হবে।⁽²⁸⁾

بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي

আমাকে তরবারী দিয়ে পাঠানো হয়েছে যতক্ষণ না লা শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় আর আমার রিযিক রাখা হয়েছে বর্ষার নিচে।⁽²⁹⁾

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

জেনে রাখো জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে³⁰

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال/ ٣٩]

তাদের সহিত যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা⁽³¹⁾ শেষ হয়ে যায় এবং ধীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।⁽³²⁾

সূরা তাওবাতে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে,

(27) { (বুখারী কিতাবুল মানাকিব বাবু মা জাআ ফি আসমাই রসুলিল্লাহ ﷺ মুসলিম কিতাবুল ফাদাঈল বাবু মা জাআ ফি আসমাইহি (ﷻ) }

(28) বুখারী ও মুসলিম

(29) মুসনাদে আহমদ শূআইব আলআরনাউত এবং আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন (সিলসিলাতু আদদাইফা ১৬৯৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য) কিন্তু ইরওয়উল গালীলে আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন আর মূলভাব পূর্বের হাদীসটির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লাহই ভাল জানেন।

(30) বুখারী ও মুসলিম

(31) ইবন জারীর তাবারী তার তাফসীরে ইবন আব্বাস, হাসান, সুদী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন (الفتنة—هكر شذا) ফিতনা বলতে আয়াতে শিরক বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মুসলিম দের ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য যা কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয় তাই ফিতনা। (তাফসীরে তাবারী দ্রষ্টব্য)

(32) সূরা আনফাল /২৯

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة/ ٢٩]

আহলে কিতাবীদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ (ﷻ) ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করেনা এবং সত্য দ্বীন গ্রহন করে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করে।⁽³³⁾

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন স্থানে যে সেনা পাঠাতেন তাদের বলতেন প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে ডাকো যদি তারা গ্রহন না করে তবে জিজিয়া প্রদান করতে বলো যদি তাও না করে তবে আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়ে হামলা করো⁽³⁴⁾

উক্ত আয়াত ও এ হাদীসটির কারনে আলেমদের ইজমা যে, দুনিয়ার যে প্রান্তেই, কোন কাফির রাষ্ট্র থাকুক যদি তাদের সাথে পূর্বেই সন্ধি চুক্তি না হয়ে থাকে তবে তাদের অপমানিত অবস্থায় কর দিতে বাধ্য করা অথবা হামলা করে পর্যদুস্ত করা মুসলিমদের জন্য কেবল জায়েজই নই বরং ওয়াজীব।

وقتل الكفار واجب وإن لم يبدؤوا

কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করা ওয়াজীব যদিও তারা আগে শুরু না করে⁽³⁵⁾

আল কুরতুবী বলেন,

قال ابن عطية: والذي استمر عليه الاجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قلّم: من قام من المسلمين سقط عن الباقيين، إلا أن يزل العدو بساحة الاسلام فهو حينئذ فرض عين

ইবনে আতীয়া বলেন, যে বিষয়টির উপর ইজমা হয়েছে তা হলো মহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মতের সকলের উপর জিহাদ হলো ফরজে কিফায়া যদি একদল লোক আদায় করে তবে অন্যদের উপর এর দায়িত্বভার থাকে না তবে শত্রু আগমন করলে এটা ফরজে আইন হয়ে যায়।

(তাফসীরে কুরতুবী)

দেখা যাচ্ছে শত্রু আগে আক্রমণ করলে জিহাদ ফরজে আইন আর শত্রু আগে আক্রমণ না করলেও

(33) সূরা তাওবা / ২৯

(34) মুসলিম ও অন্যান্য

(35) হিদাইয়া, ফাতহুল কাদীর, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদি। কানযুদ দাকাইক ও শারহে বেকায়ার কিতাবুসসিয়ারেও কাছাকাছি কথা লিপিবদ্ধ আছে। আলমুগনী ও অন্যান্য তাফসীর ও ফিকহের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য যেখানে বলা হয়েছে কাফিরা আক্রমণ করার পূর্বেই তাদের আক্রমণ করা ফরজে কেফায়া আর কাফিরদের পক্ষ হতে আক্রান্ত হলে তা প্রতিহত করা ফরজে আইন।

জিহাদ ফরজে কিফায়া আর এই বিষয়ের উপর ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। আর বলা বাহুল্য যে গনতন্ত্রের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

<# গনতন্ত্রের প্রতি নবী সুলাইমান (عليه السلام) এর দ্যার্থহীন হুমকী #>

এ বিষয়ে সুরা নামলে⁽³⁶⁾ বর্ণিত সুলাইমান (عليه السلام) এর পররাষ্ট্রনীতির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাই যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে। যখন তিনি খোজ করে হুদহুদ নামক পাখিটিকে পেলেন না এবং বললেন,

مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠) لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ [مِذَا ٢٠/]

[২১]

- কি ব্যাপার আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে কি অনুপস্থিত? আমি তাকে ভীষণ শাস্তি দেব অথবা আমি তাকে জবেহ করব। তবে যদি যে যুক্তি সঙ্গত কোন কারন পেশ করতে পারে তা ভিন্ন কথা। (নামল ২০,২১)

কিছুক্ষন পরই হুদহুদ ফিরে আসলে অন্যান্য পাখিরা বলল,

— ما خلفك، فقد نذر سليمان دمك

- তুমি কি কারনে দেরি করলে? নবী সুলাইমান তো তোমার রক্ত ঝড়ানোর ওয়াদা করেছেন। (ইবন কাসীর)

হুদহুদ বলল,

- (هل استثنى) তিনি কি কোন সুযোগ রেখেছেন?

তারা বলল ,

- হ্যা তিনি বলেছেন তোমাকে উপযুক্ত প্রমাণ হাজীর করতে হবে।

হুদহুদ এবার নিশ্চিত হল, সে বলল।

- (نجوت اذا) তাহলে আমি বেচে গেছি। (ইবন কাছির)

হুদহুদের ব্যাপারে চিন্তা করুন। সে একটি পাখি, সুলাইমান (عليه السلام) কে পানি খুজে দেওয়া তার কাজ। সে আসতে দেরি করলে আল্লাহর নবী তাকে হত্যা করার ওয়াদা করে ফেললেন। তবে উপযুক্ত কারন দর্শাতে পারলে অবশ্য তাকে রক্ষা করা হবে। উপযুক্ত কি কারনই বা হুদহুদ দেখাতে পারে? হুদহুদ কিন্তু নিশ্চিত ই ছিল নিজের উপর তার পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস রয়েছে। এমন কোন ওয়র নিশ্চয় তার আছে যা শুনলে

(36) সুরা নামলের ২০ থেকে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত।

আল্লাহর নবী তাকে নিস্তার দেবেন। হৃদহৃদের সেই ওয়রের কথাই এবার শুনুন।

হৃদহৃদ বলতে আরম্ভ করল,

فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ بَنِيَّ يَقِينًا إِنَِّّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
(২৩) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
(২৪) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (২৫) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [النمل/২২-২৬]

আমি এমন এক খবর অবগত হয়েছি যা আপনি অবগত নন। আমি সাবা থেকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসছি। আমি সেখানে একজন মহিলাকে দেখেছি যে তাদের উপর রাজত্ব করে তাকে প্রয়োজনীয় সব কিছুই দেওয়া হয়েছে তার একটি বড় সিংহাসনও আছে। আমি দেখেছি সে এবং তার সম্প্রদায় সূর্য পূজা করে। শয়তান তাদের নিকট তাদের অশুভ কাজ সমূহকে সাজিয়ে দিয়েছে এবং তাদের আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে। তারা তো আল্লাহর ইবাদত করেনা যিনি আসমান ও জমিনের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে আবহিত এবং তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন কর অথবা প্রকাশ কর। আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি আরশের অধিপতি (নামল ২২-২৬)

সুলাইমান عليه السلام বললেন,

سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النمل/২৭]

- আমি যাচায় করে দেখব তুমি ঠিক বলেছ নাকি মিথ্যা বলেছো।

হৃদহৃদ পূর্ব হতেই আচ করতে পেরেছিল যে নবীকে আল্লাহ শিরক কুফর বিনাশ করার জন্য পাঠিয়েছেন। যাকে মানব দানবের উপর কতৃত্ব দিয়েছেন তার অগোচরে একদল কাফির আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ﷻ পরিবর্তে অন্য কোন সৃষ্টির পূজা করে এ খবর কত গুরুত্বপূর্ণ! এ খবর শুনা মাত্র যে তার সাত খুন মাফ হয়ে যাবে সে বিষয়ে সে পরিপূর্ণ নিশ্চিত ছিল। তাই তো সে পরম তৃপ্তির সাথে বলেছিল

نجوت اذا

তাহলে আমি বেচে গেছি।

একটু ভাবুন তো এ খবর সুলাইমান عليه السلام এর কাছে কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? সাবার রানী কি স্বসৈন্য তড়িৎ আক্রমণ করে সোলেমানী রাজ্য হারখার করে দেওয়ার জন্য কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনা করেছিল? হৃদহৃদের দেওয়া তথ্যের মধ্যে কি এমন কিছুর উল্লেখ আছে?

না। সাবার রানীর অপরাধ ছিল কেবল এই যে, সে এবং তার সম্প্রদায় সূর্যপূজা করতো তারা ইসলাম

ছাড়া ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাই তাদের প্রতি সুলাইমানের (عليه السلام) সতর্ক বার্তা পৌছে গেল।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ [النمل/ ৩০, ৩১]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

তোমরা আমার উপর বাড়াবাড়ি করোনা এবং মুসলিম হয়ে আমার নিকট এসো (নামল ৩০, ৩১)

এ ধরনের স্পষ্ট হুমকিতে সাবার রানীর হৃদয়দেশে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। আপতিত সমস্যাটি স্বীয় পরিষদ বর্গের সামনে উপস্থাপন করে বললেন,

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ [النمل/ ৩২]

হে আমার পরিষদবর্গ উদ্ভূত সমস্যাতে আমাকে পরামর্শ দান করুন। আমি তো আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহন ছাড়া কোন বিষয়েই রায় দিই না। (নামল ৩২)

বোঝা যাচ্ছে সাবার রানী গনতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল। সুলাইমান (عليه السلام) কিন্তু চিঠি লেখার সময় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরামর্শ নেননি কারন তার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পথ নির্দেশ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাদের যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন আসমানী ব্যবস্থাতে বিশ্বাসী নই। যায় হোক সুলাইমান (عليه السلام) সেই গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি পুরোপুরি অগনতান্ত্রিক পন্থায় হুমকি ধামকি দিলেন। তার হুমকিতে কাজও হয়েছিল সাবার রানী নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে নরম পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন,

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ [النمل/ ৩৫]

- আমি হাদীয়া উপটৌকন পাঠিয়ে দেখি কি হয়? (নামল ৩৫)

সুলাইমান (عليه السلام) এর নিকট যখন সাবার রানী কর্তৃক প্রেরিত হাদীয়া পৌছল তিনি রেগে অগ্নিস্বর্মা হয়ে বললেন,

أُتِمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ (৩৬) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ [النمل/ ৩৬, ৩৭]

তোমরা কি আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে তা তোমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তোমরা তো হাদীয়াকেই যথেষ্ট মনে করছো। ফিরে যাও! আমি এমন এক সেনাবাহিনী নিয়ে হাজীর হব যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই আমি নিশ্চয় তাদের দেশ হতে বিতাড়িত করব অপমানিত ও নিচ অবস্থায়। (নামল ৩৬, ৩৭)

<# কাফিরদের আগে আক্রমণ করা বৈধ কিনা #>

এর পরও যদি কোন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে বলতে শোনা যায় ইসলাম আগে আক্রমণ করার অনুমতি দেয় না। তবে এসকল স্বাভাবিক চৈতন্যহীন চিন্তাবিদদের কথায় আমাদের দুঃচিন্তা তো বাড়তেই পারে। এরা পাশ্চাত্যের বিকৃত সংস্কৃতি ও দর্শন নিয়ে এতটাই বেশি চিন্তা গবেষণা করেছে যে, কোরআন হাদীসের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগও ঘটেছে কেবল কাকতালীয় ভাবে। অপরাধ এদের নই যারা এদের ফতওয়াকে মান্য করে তারাই প্রকৃত অপরাধী।

<# “দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তী নেই” কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা #>

এসকল চিন্তাবিদদেরই কোন একজন যথাবিহিত গান্ধীর্যপূর্ণ স্বরে বলতে পারেন,

- জনাব, আল্লাহ (ﷻ) যে বলেছেন “লা ইকরাহা ফিদ দ্বীন” এটার কি হবে?

কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর মোটেও জটিল নই। যত জটিলতা কুটিলতা শুধু এসব বিকলতার স্বীকার মানুষগুলোর রোগাক্রান্ত অন্তরে। তুমি যখনই এদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেবে এরা অন্য আর একটি প্রশ্ন করে বসবে। সত্যকে সত্যায়ন করা এদের উদ্দেশ্য নয়। এদের উদ্দেশ্য কেবল মিথ্যাকে নানা রঙে সাজিয়ে পথিককে হারান করা। আমরা এর পূর্বেও বেশ কিছু আয়াতের সঠিক তাফসীর পেশ করেছি সুরা বাকারার এই আয়াতটির সঠিক মর্মার্থও ইনশাআল্লাহ তুলে ধরব কিন্তু আমন্ত্রণ কেবল নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের। ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة/২০৬]

দ্বীনের ভিতর কোন জবরদস্তি নাই (সুরা বাকারা/২৫৬)

বর্তমানে এই আয়াতটি বিভিন্নজনের পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত হচ্ছে।

১. অনেকের মতে মুসলিমদের সলাত, সওম, দাড়া, পর্দা ইত্যাদি কর্মে বাধ্য করা যাবে না কারন ধর্মে জোর জবরদস্তি করা নিষেধ। বলাবাহুল্য, এ আয়াতের এই মর্মার্থ গ্রহণযোগ্য নই কারন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين

তেমাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়স থেকে সলাতের আদেশ কর। আর যখন তাদের বয়স হয় ১০ বছর তখন সলাত না পড়লে তাদের প্রহার কর।^(৩৭)

(৩৭) আবুদাউদ, মিশকাত, রিয়াদুসসালিহীন, মুসনাদে আহমদ আলবানী সহীহ বলেছেন

হযরত আবুবকর (ؓ) এর খিলাফত কালে যারা যাকাত অস্বীকার করেছিল তাদের সাথে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন হযরত উমর (ؓ) প্রথমে এব্যাপারে কিছু আপত্তি করলে তিনি বললেন

لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

তারা যদি একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা আল্লাহর রসুল (ﷺ) তাদের নিকট হতে নিতেন তবে আমি সে কারনে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত উমর (ؓ) বলেন ,

فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ আবুবকরের অন্তরকে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন আমি বুঝলাম তিনিই সত্যের উপর রয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবুবকর (ؓ) এর এ সিদ্ধান্ত সমস্ত সাহাবাদের সম্মুখে ঘোষিত হয়েছিল, যুদ্ধও হয়েছিল, তারা কেউই আপত্তি করেননি যারা আপত্তি করেছিলেন তারাও শেষ পর্যন্ত আবুবকর (ؓ) এর মতই মেনে নিয়েছিলেন সুতরাং এ বিষয়টার উপর সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ইবন হাযার আল আসকালানী বলেন,

قال مالك في الموطأ الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده قال بن بطال مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك

ইমাম মালিক তার মুয়াত্তাতে বলেছেন আমাদের সিদ্ধান্ত হল যদি কেউ আল্লাহ (ﷻ) যা কিছু ফরজ করেছেন তার কোন অংশ পালন করতে নারাজ হয় এবং কোন ভাবেই মুসলিমরা তার নিকট হতে তা আদায় না করতে পারে তবে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হবে তার সাথে যুদ্ধ করা। ইবন বাত্তাল বলেন ইমাম মালিকের উদ্দেশ্য হল যদি সে ব্যক্তি উক্ত বিষয়টি যে ফরজ তা স্বীকার করে (অর্থাৎ সে মুসলিম থাকে কারন ফরজ অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায় তখন তাকে হত্যা করা ওয়াজীব হয়ে যায়) ইবন বাত্তাল বলেন এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই (ফাতহুল বারী)

সুতরাং এবিষয়ে আলেমদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে, একজন মুসলিমকে ফরজ কর্ম সমূহ করতে বাধ্য করা হবে। অতএব জবরদস্তি না করা সংক্রান্ত আয়াত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উক্ত আয়াতের অধরনের অর্থও গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. অনেকে মনে করেন যে যার ইচ্ছা মত ধর্ম গ্রহন বা বর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই সাত আসমানের উপর থেকে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। যেভাবে কোন অমুসলিম যে কোন সময় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে একই ভাবে একজন মুসলিমও যে কোন মুহুর্তে নিজেকে শিরক কুফরের

আগুনের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করতে পারে এতে কোন বাধা নিষেধ নেই। ইহাও পূর্বাবত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে প্রবেশ করাটা সাদরে সমাদৃত বটে কিন্তু উল্টোটি দারুনভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ আমাদের এধরনের দুর্মতি থেকে রক্ষা করুন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ,

من بدل دينة فاقتلوه

যে দ্বীন পরিবর্তন করে (মুসলিম হওয়ার পর কাফির হয়ে যায়) তাকে হত্যা করো। (বুখারী)

ইবন কুদামা বলেন ,

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد

আলেমদের ইজমা যে, মুরতাদকে (যে ইসলাম হতে ফিরে যায়) হত্যা করতে হবে। (আলমুগনী)

সুতরাং উক্ত আয়াত এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না।

৩. কেউ কেউ বলেন কাফিরদের তাদের স্বীয় ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে দিতে হবে, তাদের আগে আক্রমণ করা যাবে না ইত্যাদি। এবিষয়ের ভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এখানে কেবল এতটুকু বলতে চায় যে, প্রতিটা কাফিরকে তার কুফরী ধর্মমতের কারণে অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করা হবে এটা ইজমা। যে কুফরী রাষ্ট্রের সহিত আমাদের পূর্বচুক্তি নেই তাদের উপর আগে আক্রমণ করা আমাদের উপর ওয়াজিব এটা ইজমা। কাফিররা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হয়ে মুসলিমদের বেধে দেওয়া সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে ধর্ম পালন করতে পারবে ঠিকই কিন্তু ইসলাম, ধরাপৃষ্ঠে কাফিরদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ দেবে না। যদি কোথাও তাদের প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র থেকেও থাকে তবে সুরা নামলের ঘটনার মত খবর পাওয়া মাত্র তা মুসলিমদের রোযানলে পড়বে।

যা কিছু বর্ণনা করলাম তার সবই আলেমদের ইজমা সুতরাং উক্ত আয়াতকে ব্যবহার করে সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তা জায়েজ হবে না, সফলও হবেনা। উক্ত আয়াতকে কেবলমাত্র তার বৈধ স্থানেই প্রয়োগ করতে হবে। যেমন, যদি কোন আহলে কিতাব বা মাজুসী জিজিয়া কর দিতে রাজী হয় তবে তাকে মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে না এই স্থলে আয়াতটি ব্যবহার করলে দোষনীয় হবে না। আর সমস্ত প্রশংসা কেবল মাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের।

<# অন্য ধর্মের লোকদের বিশ্বাস ও কর্মের সমালোচনা #>

- অন্য ধর্মের লোকদের সামনে তাদের ধর্মকে ছোট করতে নেই। তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করতে নেই। এমন মিষ্টি মধুর উপদেশ দাতার অভাব নেই। এদের দলীলও খুব শক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام/ ১০৮]

এবং তুমি মন্দ বলিওনা তারা যাহাদিগকে উপাসনা করে ঐসব উপাস্যদিগকে কারন তাহলে তাহারাও শত্রুতা ও অঙ্কতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে।

(আনআম/১০৮)

মজার ব্যপারটি এই যে তারা মনে করে এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুশরিকদের উপাস্যদিগকে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, খুব দৃঢ় কঠে যা বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করা হবে, যা ভেঙে ফেলার আদেশ করা হবে তাকেই নাকি সম্মান করতে হবে!

আমর ইবন আবাসা (رضي الله عنه) রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে প্রশ্ন করলেন,

بأي شيء أرسلك

আল্লাহ আপনাকে কি আদেশ দিয়ে প্রেরন করেছেন?

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم

যাতে লা শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, মূর্তি ভেঙে ফেলা হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হয়।⁽³⁸⁾

মুস্তাদরাকে হাকিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে,

أن تعبد الله و تكسر الأوثان و الأديان

আমাকে পাঠানো হয়েছে মূর্তি ও অন্য সমস্ত ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য।

সেখানে বলা হয়েছে আমর ইবন আবাসা (رضي الله عنه) সব শুনে বললেন,

نعم ما أرسلك به

আল্লাহ আপনাকে কত উত্তম দায়িত্ব দিয়ে প্রেরন করেছেন।

ইব্রাহীম (عليه السلام) এর মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনী

ইব্রাহীম (عليه السلام) এর মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনীটি শুনুন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢)

⁽³⁸⁾ মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম শুআইব আল আরনাউত বলেছেন হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ হাকিম ও আজজাহাবী সহীহ বলেছেন।

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ
 اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ
 أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (٥٧) فَجَعَلَهُمْ جَذَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَنِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٥٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (٦٠) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
 (٦١) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ (٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٦٣) فَارْجِعُوا
 إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (٦٤) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (٦٥) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (٦٦) أَفَ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٧) قَالُوا حَرِّقُوهُ
 وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ [الأنبياء/٥١-٦٨]

আমি এর পূর্বে ইব্রাহীমকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সম্মক অবগত ছিলাম।
 যখন সে তার বাবা ও নিজ জাতিকে বলল,

- তোমরা কেন এসকল মূর্তির সামনে নিমগ্ন হয়ে পড়ে থাকো?

তারা বলল,

- আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এমন করতে দেখেছি (তাই আমরা করি)

তিনি বললেন,

- তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

তারা বলল,

- তুমি কি সত্য সহই প্রেরিত হয়েছেো নাকি তুমি তামাশা করছো?

তিনি বললেন,

- আমি তামাশা করছি না বরং আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাদের একমাত্র রব
 আমি এবিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

এরপর ইব্রাহীম (عليه السلام) মনে মনে বললেন,

- তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি অবশ্যই তোমাদের ইলাহ সমূহকে বিপাকে ফেলব।

তারপর তিনি মূর্তিগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন শুধু বড় মূর্তিটিকে অক্ষত রাখলেন যাতে তারা ফিরে
 এসে এই কাণ্ড অবলোকন করে।

তারা ফিরে এসে বলল,

- আমাদের উপাস্যদের সহিত এহেন আচরন কে করেছে?

কেউ কেউ বলল,

- আমরা একটি যুবককে আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলতে শুনেছি। তার নাম ইব্রাহীম।

তারা বলল,

- তবে তাকে জনসম্মুখে নিয়ে এসো যাতে তারা দেখে আমরা তার সহিত কি আচরন করি।

তারা বলল,

- ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সহিত এমন আচরন করেছো?

ইব্রাহীম (عليه السلام) বললেন,

- না বরং এই বড় মূর্তিটিই অন্য মূর্তিগুলোর এই অবস্থা করেছে। যদি ওরা কথা বলতে পারে তবে ওদেরকেই প্রশ্ন করুন না।

একথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করল তারা বলল আসলে তোমরাই ভুলের উপর আছো।

তারপর মাথা নত করে বলল,

- তুমি তো জানো এরা কথা বলতে পারে না।

ইব্রাহীম (عليه السلام) বললেন,

- তবে কি তোমরা এমন কিছুই ইবাদত কর যা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নই।
ধিক তোমাদের আর তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের।

তারা বলল,

- ওকে আগুনে পুড়াও তোমাদের ইলাহ সমূহের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নাও

যা কিছু উল্লেখ করলাম তা সুরা আশ্বিয়ার ৫১ থেকে ৬৮ নং আয়াতের হুবহু অনুবাদ।

এখানে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যিক

১. আল্লাহ প্রথমেই বলেন (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) যখন ইব্রাহীম (عليه السلام) তার বাবা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলল এ অংশটুকু হতে স্পষ্ট যে ইব্রাহীম (عليه السلام) এর সম্মুখে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের উপস্থিতি ছিল তিনি তাদের সাথে মূর্তি পূজার ব্যাপারে কথা বলছিলেন একপর্যায়ে তারা যখন বলল আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের এমনই করতে দেখে আসছি ইব্রাহীম (عليه السلام) জনতার সম্মুখে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ [الأنبياء/ ٥٤]

তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছো। (আম্বিয়া/৫৪)

২. আল্লাহ (ﷻ) বলেন ,

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ [الأنبياء/ ৫৮]

তিনি মূর্তিগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন যাতে তারা ফিরে এসে অবলোকন করে।
(আম্বিয়া ৫৭)

সূতরাং আল্লাহ (ﷻ) বলেননি (فكسرهم) তিনি মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন বরং তিনি বলেছেন (فَجَعَلَهُمْ) তিনি সেগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন ভেঙে ফেলা আর চূর্ণ বিচূর্ণ করার মধ্যে কি পার্থক্য তা সকলেই বোঝে। মূর্তি গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করার পর মূর্তিপূজকেরা সেগুলো দেখলে কষ্ট পেতে পারে এমন ভেবে তিনি ভাঙা টুকরো গুলো লুকিয়ে ফেলার চেষ্টাও করেননি বরং আল্লাহ (ﷻ) বলছেন তিনি মূর্তি পূজকদের দেখানোর জন্যই মূর্তিগুলো ভেঙেছেন,

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

যাতে তারা ফিরে এসে অবলোকন করে। (39)

৩. মূর্তিপূজারীরা বলল

سَمِعْنَا قَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ [الأنبياء/ ৬০]

আমরা একটা যুবককে আমাদের উপাস্যসমূহকে মন্দ বলতে শুনেছি তার নাম ইব্রাহীম। (আম্বিয়া ৬০)

অর্থাৎ ইব্রাহীম (عليه السلام) যে তাদের ইলাসমূহকে মন্দ বলে এটা সর্বজন বিদিত ছিল।

৪. মূর্তি ভাঙার অপরাধে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তাকেই অভিযুক্ত করল এবং বলল (فَأْتُوا بِهِ عَلَى) তাকে জননস্মৃতি নিয়ে এসো যাতে তারা দেখতে পারে। এবং আলোচনার শেষে যখন প্রমানিত হল মূর্তি গুলো কোন উপকার এবং ক্ষতি করতে সক্ষম নই এমনকি তারা কথাও বলতে পারে না ইব্রাহীম (عليه السلام) উপস্থিত জনতার সামনে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন,

فَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [الأنبياء/ ৬৭]

(39) তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে { يرجعون } فيرون ما فعل بغيره) অর্থাৎ যাতে তারা বড় মূর্তিটির নিকট ফিরে আসে এবং দেখে অন্য গুলোর সাথে সে কেমন আচরন করেছে।

ধিক! তোমাদের এবং তোমরা যাদের উপাসনা করো তাদের তোমরা কি কিছুই বোঝনা। (আম্বিয়া ৬৮)

৫. ইব্রাহীম (عليه السلام) এর এধরনের অগনতান্ত্রিক আচরনে মূর্তিপূজারীরা নিশ্চয় কষ্ট পেয়েছিল তা না হলে তারা কেন বলবে,

حَرْقُوهُ وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ [الأنبياء/ ৬৮]

ওকে আগুনে পুড়াও তোমাদের ইলাহ সমূহের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নাও (সূলা আম্বিয়া /৬৮)

<# ইসলামের ইতিহাসে মূর্তিভাঙার আরো কিছু ঘটনা #>

ইসলামের ইতিহাসে মূর্তিভাঙার আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা রয়েছে,

১ . হযরত আবু দারদা (رضي الله عنه) ও আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (رضي الله عنه) জাহেলী যুগে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (رضي الله عنه) আবু দারদা (رضي الله عنه) এর পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (رضي الله عنه) প্রায়ই তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিতেন না। তার একটি মূর্তি ছিল তিনি সেটির উপাসনা করতেন। একদিন আবুদারদা (رضي الله عنه) এর অনুপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (رضي الله عنه) তার মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে মূর্তিটি ভাঙতে লাগলেন। আবু দারদা (رضي الله عنه) এর স্ত্রী কুড়ালের শব্দে শুনে ছুটে এসে বললেন ,

- ওহে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (رضي الله عنه) তুমি তো আমাকে ধংস করে ফেললে!

মূর্তি ভাঙার কাজ সমাপ্ত করে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (رضي الله عنه) প্রস্থান করলেন। আবুদারদা (رضي الله عنه) ফিরে এসে তার স্ত্রীকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলেন সব কিছু শুনে এবং নিজ চোখে দেখে তিনি ভীষন রেগে গেলেন পরক্ষণেই চিন্তা করলেন যদি সত্যিই এর কোন ক্ষমতা থাকত তবে নিজেকে নিশ্চয় রক্ষা করতে পারত। ফলে তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

২ . মদিনাতে যখন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যুবকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের জোয়ার পড়ে গিয়ে ছিল সে সময়ও যেসব প্রবীন ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম থেকে দূরে থেকে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমর ইবন আলজামুহ। তার একটি কাঠের মূর্তি ছিল। তিনি সেটিকে পবিত্র জ্ঞান করতেন এবং সম্মান করতেন। সেটিতে সুগন্ধি মাখাতেন, এবং তার উপাসনা করতেন। তার ছেলে মুআজ এবং অন্যান্য মুসলিম যুবকেরা প্রতি রাতে মূর্তিটিকে চুরি করে নিয়ে যেতেন এবং এমন আবর্জনাময় গর্তে নিক্ষেপ করতেন যেখানে অন্যান্য আবর্জনা তো বটেই এমনকি মানুষের মল মুত্র ফেলা হত। আমর প্রতিদিন সকালে পূজা করতে যেয়ে মূর্তিটিকে না পেয়ে ভীষন রেগে যেতেন। এদিক সেদিক খোঁজ করে যখন আবর্জনাময় গর্তে সেটিকে উল্টো হয়ে পড়ে থাকতে দেখতেন তখন তার মনের অবস্থা কি হত তা আশা করি মূর্তির প্রতি মমতাশীল পণ্ডিতবর্গ টের পাবেন। মূর্তিটিকে ওভাবে আবিষ্কার করে তিনি বলতেন ,

أما والله لو أعلم من يصنع هذا بك لأحرقه

যদি আমি জানতাম কে তোমার সাথে এমন আচরন করেছে তবে আমি তাকে পুড়িয়ে মারতাম।

এরপর তিনি মুর্তিটাকে আবার পবিত্র করতেন সুগন্ধি মাখাতেন এবং তার জন্য নির্ধারিত স্থানে রেখে দিতেন। প্রায়ই এমন হতে থাকায় শেষে বিরক্ত হয়ে মুর্তিটির গলায় একটি তরবারী ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন - যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যান থাকে তবে নিজেকে নিজে রক্ষা করো।

সেদিনও পূর্বের মত মুর্তিটি চুরি করা হল। মুর্তিটির গলা হতে তরবারীটি কেড়ে নিয়ে একটি মৃত কুকুর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেটিকে গর্তে নিক্ষেপ করা হল। পরদিন সকালে মুর্তিটিকে মৃত কুকুরের সাথে গলাগলি করে পড়ে থাকতে দেখে আমরের হুশ ফিরল। তিনি বললেন,

لو كنت إلهًا لم تكن أنت و كلب وسط بئر في قرن

যদি তুমি সত্যিই ইলাহ হতে তবে নিশ্চয় একটি কুকুরের সাথে গলা জড়িয়ে কুপের মধ্যে পড়ে থাকতে না। (40)

এ ঘটনার পর তিনি মুসলিম হয়ে যান।

৩ . হিজরতের পর হযরত আলী (রাঃ) দেখলেন একজন মুসলিম মেয়ের বাড়িতে রাত্রে একজন পুরুষ আগমন করে তার দরজাতে টোকা দেয়। মেয়েটি দরজা খুললে তার হাতে কিছু একটা দিয়ে ছেলেটি বিদায় হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) মেয়েটিকে প্রশ্ন করলে সে বলে ,

ঐ ব্যক্তি হলেন সাহল ইবন হুনাইফ তিনি তার নিজ সম্প্রদায়ের মুর্তিগুলো ভেঙে আমাকে দিয়ে যান আমি তা দ্বারা উনুন জ্বালাই। (41)

মুর্তিপ্রেমিক পণ্ডিতবর্গ এই উষ্ম অভ্যর্থনায় নিশ্চয় আভিভূত হবেন না?

৪ . হযরত আলী (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে নিয়ে কাবা ঘরের মুর্তিগুলোর নিকটে গেলেন। আমাকে বললেন বসো। আমি বসলে তিনি আমার কাধে চেপে বসলেন কিন্তু আমি তাকে বহন করতে পারলাম না। এবার তিনি বসে আমাকে তার কাধে উঠতে বললেন আমি তার কাধে উঠে বসলে তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাড়ােলেন আমার মনে হল আমি ইচ্ছা করলে আকাশ ছুয়ে ফেলতে পারি। তারপর আমি তাদের সবচেয়ে বড় মুর্তিটি হাতে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। সেই মুর্তিটি আমার তৈরি ছিল এবং লোহার পেরক দ্বারা আটকানো ছিল আমি সেটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে থাকলাম আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলছিলেন।

(40) বায়হাকী দালাইলুন নুবুওয়া, সীরাতে ইবন হিশাম

(41) সীরাতে ইবনে হিশাম, উয়ুনুল আছার, ইবন কাছীরের সীরাতে গ্রন্থ

- হ্যা হ্যা (অর্থাৎ ওভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাও)

আমি চেষ্টা করতেই থাকলাম শেষে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন

ওটা চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেল। অবশেষে আমি ওটা ভেঙে ফেলতে সক্ষম হলাম।⁽⁴²⁾

যারা বলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে কোন মূর্তি ভাঙেননি হাদীসটি তাদের বিরুদ্ধে দলীল। মূর্তি যখন ভেঙে ফেলতেই হবে তখন মাক্কী যুগ আর মাদানী যুগের কি পার্থক্য তা কেবল মূর্তি বিশারদরাই বলতে পারেন। মূর্তির গায়ের মাটি কোন ঋতুতে নরম থাকে তা আমাদের জানা থাকার কথা নই। তছাড়া ইব্রাহীম (عليه السلام) যে মূর্তি ভেঙেছিলেন তা কি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর?

<# কোনো অমুসলিম কষ্ট পাবে এই জন্য তার ধর্মকে সমালোচনা করা যাবে না এ কথার কোনো ভিত্তি নেই #>

ইব্রাহীম (عليه السلام) এর ঘটনার মধ্যই আমরা দেখেছি কিভাবে কাফিরদের মুখের সামনে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে এবং তাদের স্পষ্ট পথভ্রষ্ট বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

উহদের প্রান্তরে তথাকথিত বিজয় অর্জনের পর আবু সুফইয়ান যখন গর্ব করে বলল একবার তোমরা বিজয় অর্জন করেছো আর একবার আমরা বিজয়ী হয়েছি। উমর তার মুখের সামনে বললেন ,

ليس سواء قتلتنا في الجنة و قتلاكم في النار

সমান নই কারন তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী আর আমাদের নিহতরা জান্নাতী⁽⁴³⁾

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে যখন কুরাইশদের এক বৈঠকে নাদর ইবন হারিছ বিভিন্ন রকম তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় রসুলুল্লাহ (ﷺ) সবার সামনে তাকে এই আয়াত শুনিয়ে দেন,

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (৭৮) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِ اللَّهِ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ
[الأنبياء/ ৭৮, ৭৭]

তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা করো জাহান্নামের জালানী হবে। তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে যদি ওরা উপাস্যই হত তবে জাহান্নামে প্রবেশ করতনা। আর তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।⁽⁴⁴⁾

(42) হাকিম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন।

(43) হাকিম তার মুস্তাদরাকে এবং বলেছেন বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ আজজাহাবীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(44) আয়াত দুটি সুরা আশ্বিয়া ৯৮ ও ৯৯ নং আয়াত আর ঘটনাটি তাফসীরে তাবারী , ইবনে কাছির, কুরতুবী , ইবনে হিশাম ইত্যাদী গ্রন্থ বর্ণিত আছে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

যার হাতে আমার প্রান সেই সত্তার শপথ ইয়াহুদী খৃষ্টান বা যে কেউই আমার কথা শুন্যর পরও আমার উপর ইমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরন করে সে জাহান্নামবাসী হবে। (মুসলিম)

একজন গ্রাম্য লোক রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে প্রশ্ন করল আমার বাবা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করত আরও এই এই ভাল কাজ করত তিনি জান্নাতী না জাহান্নামী?

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

-জাহান্নামী।

গ্রাম্য ব্যক্তিটি প্রশ্ন করল?

-তবে আপনার বাবা? রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ,

তুমি যে মুশরিকের কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে তাকেই জাহান্নামের দুঃসংবাদ দাও। ঐ ব্যক্তি (রাঃ) বলতেন রসুলুল্লাহ আমাকে এই কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন যে, আমি যে মুশরিকের কবরের পাশ দিয়ে গমন করব তাকে জাহান্নামের সংবাদ দেব।⁽⁴⁵⁾

এমন অনেকেই কি নেই? যারা মাদার তেরেসা, রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফকীর লালন, ইত্যাদি বিধর্মীদের জাহান্নামী বললে রাগ করে বলেন,

- কাউকে জাহান্নামী বলতে নেই। কারও মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে নেই।

আমরা এদের কিছুই বলব না। শুধু বলব ঈমান নবায়ন করুন। কোন কাফিরের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করলে ঈমান থাকে না।

আমরা যা বলতে চায় তা হল রসুলুল্লাহ (ﷺ) সহ আল্লাহর সমস্ত নবী রাসুলেরা কাফিরদের দ্বীন ও উপাস্যদিগকে সমালোচনা ও তিরস্কার করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা সারা জীবন সেই কাজ ভিন্ন অন্য কিছুই করেননি। এমনকি আবু জেহেল কুরাইশদের সমাবেশে বলল,

يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا ، و شتم آبائنا ، و تسفيه أعلامنا ، و سب آلهتنا ، و إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ، فإذا سجد في صلاته فضحت به رأسه (دلائل النبوة للبيهقي - ج ٢/ص ٦٥)

(45) ইবন মাযা , আসসিলসিলাতুস সাহীহাহা হাদীস নং ১৮ হাদীসটি সহীহ

ওহে কুরাইশেরা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ মুহাম্মদ (ﷺ) কি করছে। সে তো আমাদের ধর্মকে ভুল বলছে আমাদের পূর্বপুরুষদের মন্দ বলছে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে খাটো করছে আমাদের উপাস্যসমূহকে তিরস্কার করছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আগামীকাল আমি একটি পাথর নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করব যখনই সে সাজদা করবে আমি তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করব। (বায়হাকী দালাইলুন নুবুওয়াহ)

এ কথাটিই কোরানে সংক্ষেপে এভাবে বলা আছে,

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهْذًا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ [الأنبياء/ ৩৬]

কাফিররা তোমাকে দেখলেই তামাশা করে, বলে এই ব্যক্তিই কি তোমাদের উপাস্যসমূহকে মন্দ বলে (আম্বিয়া ৩৬)

<# তাদের উপাস্যদের মন্দ বলো না এই কথার সঠিক অর্থ #>

এখন প্রশ্ন হল সুরা আনআমে তাদের উপাস্যসমূহকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে কেন? এর উত্তর উক্ত আয়াতের মধ্যেই বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام/ ১০৮]

এবং তুমি মন্দ বলিওনা তাহারা যাহাদিগকে উপাসনা করে ঐসব উপাস্যদিগকে কারন তাহলে তাহারাও শত্রুতা ও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে (আনআম/১০৮)

এখানে আল্লাহ (ﷻ) বিধর্মীদের উপাস্যদের মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন এবং তার কারনও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলছেন,

কারন তাহলে তাহারাও শত্রুতা ও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেননি, তাহলে তারা মনে কষ্ট পাবে বা তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। নিজের মতের সপক্ষে কোন আয়াত ব্যবহার করার পূর্বে তার সঠিক মমার্থ বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা যারা অনুভব করেন না তাদের ফতওয়াতে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে! এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তাফসীরে তাবারী ও ইবনে কাছিরে বর্ণিত আছে যে, আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিযে আসলে কাফিররা তার নিকট এসে বলল

وإن محمدًا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا، ولدعوه وإلهه

নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের কষ্ট দেয় সে আমাদের উপাস্যসমূহকে মন্দ বলে। আমাদের ইচ্ছা এই যে, আপনি তাকে ডেকে আমাদের উপাস্যদিগকে মন্দ বলা হতে নিষেধ করুন তা হলে আমরাও তার

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (ﷺ) বাতিল উপাস্যসমূহকে তুচ্ছ ত্যাগ করাই আসছিলেন। কিন্তু যখন ভয় হল কাফিররাও আল্লাহকে তুচ্ছ ত্যাগ করবে তখন আল্লাহর সম্মানেই একাজ থেকে তাকে নিষেধ করা হল। সোজা কথা বাতিল উপাস্যদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা কাফির মুশরিকদের কষ্ট হবে এমন ভেবে তাদের উপাস্যদিগের মন্দ বলা হতে মুসলিমদের নিষেধ করা হয়নি। এ সকল উপাস্যের মন্দ বলা পাপের কাজও নই বরং সওয়াবের কাজ কিন্তু আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কাফিরদের রাষ্ট্রে কোরআন নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। এটা এ কারণে নই যে কোরআন বহন করা পাপ কাজ বরং তা সওয়াবের কাজ কিন্তু এখানে যেহেতু কোরআনের অবমাননা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তখন এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোরআন বহন করতে হবে। একই ভাবে দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনে কাফিরদের উপাস্য ও ধর্মের সমালোচনা করতে হবে কোরআনের বহু স্থানে তা করাও হয়েছে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ [الحج/৭৩]

ওহে মানব সকল একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে উপাসনা করো তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নই যদিও তারা সকলে মিলে চেষ্টা করে। যদি মাছি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নেই তারা তা উদ্ধারেও অক্ষম। উপাসক আর উপাস্য কতই দুর্বল।⁽⁴⁷⁾

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (১৭৫) اَللّٰهُمَّ ارْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبِيْطُشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا [الأعراف/১৭৫, ১৭৬]

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাহাদের আহ্বান করো তারা তোমাদের মতই সৃষ্ট বান্দা। যদি তোমরা সত্যবাদিই হয়ে থাকো তবে তাদের ডেকে দেখো তো সাড়া পাওয়া যায় কি না। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা তারা হাটে! নাকি তাদের হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে! নাকি তাদের দেখার মত চোখ আছে! (সুরা আ'রাফ/১৯৪, ১৯৫)

কাফিরদের ইসলামের দিকে ডাকার সময় এমন মন্তব্য শুধু জায়েজ তাই নয় প্রয়োজনীও বটে যদিও এতে রাগান্বিত হয়ে কাফিররা ইসলামকে ও আল্লাহকে অবমাননা করে। এর জন্য তারাই এক তরফাভাবে দায়ী

(46) তাফসীরে ইবনে কাছির ও আততাবারী

(47) (সুরা হাজ্জ / ৭৩) চিন্তা করার বিষয় যে, এরচেয়ে কঠিন তিরস্কার আর কি হতে পারে?

হবে। এখানে একথা বললে চলবে না যে তোমরা তাদের ধর্মকে মন্দ বলো তাই তারাও তোমাদের ধর্মকে খাটো করছে এতে তোমাদের অপরাধ না হলে তাদের অপরাধ হবে কেন? কারন, তারা ভুলের উপর আছে আর আমরা সত্যের উপর আছি। যে সঠিক পথে আছে ভুলকে ভুল বলার পরিপূর্ণ অধিকার তার আছে জবাবে যদি বাতিল পন্থিরা সত্যকে মিথ্যা বলে তবে তাদের দুটি অপরাধ। এক তারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে দুই তারা ঠিককে ভুল বলছে।

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ [محمد/৩]

এটা একারণে যে, যারা কাফির তারা মিথ্যার অনুসরণ করে আর যারা মুমিন তারা তাদের রবের পক্ষ হতে আসা সত্যের অনুসরণ করে।(সূরা মুহাম্মদ/৩)

<# উপরক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ। #>

আমরা উপরে যা কিছু আলোচনা করলাম তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপঃ

<# ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এ আকীদার উপর গণতন্ত্রের আঘাত #>

১ . গণতন্ত্র মুসলিমদের আহ্বান করে নিজ ধর্ম ইসলামকেই একমাত্র সত্য ও সঠিক মনে করে অন্য সকল ধর্মকে পুরোপুরি ভুল ও ভ্রান্ত মনে না করতে। যে সকল মুসলিম আল্লাহর ফজলে এখনও এমন আকীদায় বিশ্বাসী গণতন্ত্রের পরিভাষায় তাদের গোড়া ও ধর্মাক্স বলে গালি দেওয়া হয়। তাদের গালি থেকে বাচার জন্য কোন কোন পাগড়ি পরিহিত পন্ডিত তাদের দর্শনের দীক্ষা অনুসরণ করে নিজের ঈমান ও আখিরাতে জলাঞ্জলী দিয়েছে। আমরা বলব আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [আল عمران/১৭]

আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল ইসলাম (আলে ইমরান - ১৯)

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [আল عمران/৮৫]

যে কেউই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদের অনুসরণ করে তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে (আলে ইমরান - ৮৫)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

যার হাতে আমার প্রান সেই সত্তার শপথ ইয়াহুদী খৃষ্টান বা যে কেউই আমার কথা শুন্যর পরও আমার উপর ইমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরন করে সে জাহান্নামবাসী হবে। (মুসলিম)

আফসোস! যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সঠিক নই এটা প্রমান করার জন্য এখন দলীল পেশ করতে হয়। গনতন্ত্রের প্রচার ও প্রসারের কুফল কি তা বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট।

<# অন্য ধর্ম ও তার কৃষ্টি কালচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন #>

২. অন্য ধর্ম এবং তার কৃষ্টি কালচারকে সম্মান করার প্রবনতাও গনতন্ত্রের উপহার। কোন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদেদের মুখে শুনেছিলাম ,

- যদি কোন খৃষ্টান ক্রুশ পরিধান করে বা কোন হিন্দু পৈতা বুলায় তবে আমি তাকে সম্মান করব কিন্তু মুসলিমরা কেন এসব পরিধান করছে?

মুসলিম যুবকরা গলদেশে ক্রুশকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করছে দেখে উদ্ভিগ্ন হওয়াটা নিশ্চয় দোষনীয় নই কিন্তু একজন খৃষ্টানকে ক্রুশ পরতে দেখলে আনন্দে আটখানা হয়ে যাওয়ারই বা কি কারন থাকতে পারে? উভয়েই কি আল্লাহর বান্দা নয়? একই কাজ একজনের জন্য অপরাধ হবে অন্য জনের জন্য প্রশংসিত কাজ হবে এটা শেখানোর জন্যই কি রসুলুল্লাহ (ﷺ) আগমন করেছিলেন? একজন মুসলিমের তুলনায় একজন খৃষ্টান আল্লাহর নিকট কি এতটাই প্রিয় যে, মুসলিম ক্রুশ পরিধান করলে তার জন্য কাড়ি কাড়ি পাপ লেখা হয় আর খৃষ্টান ক্রুশ পরিধান করলে প্রশংসিত হয়? মুসলিম খৃষ্টান প্রত্যেকেই আল্লাহর সৃষ্টি, সকলেই আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য। আখিরাতে ময়দানে প্রত্যেককে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার সম্মুখিন হতে হবে। জবাবদিহিতার সম্মুখিন হতে হবে খৃষ্টানদের ক্রুশ ব্যবহার করতে দেখে খুশীতে হুশ হারিয়ে ফেলা এসব জ্ঞানপাপীদেরও।

হযরত ইসা (عليه السلام) সম্পর্কে আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন ,

ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزبة

শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ইসা ইবন মারইয়াম (عليه السلام) একজন ন্যায় পরায়ন শাসক হিসাবে নাখিল হবেন।

তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া কর গ্রহন করবেন না।⁽⁴⁸⁾

কানযুদ্ধাকাইক এ বলা হয়েছে,

الاعطاء باسم الثيروز والمهرجان لا يجوز

নওরোজ বা মেহেরজান (মাজুসীদের দুটি উৎসবের দিন) উপলক্ষে কাউকে কোন উপহার দেওয়া জায়েজ নয়।

(48) বুখারী ও মুসলিম

এর ব্যাখ্যায় বাহরুর রাইকে বলা হয়েছে,

أَيُّ الْهَدَايَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ بَلْ كُفِّرَ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ وَأَهْدَى إِلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْضَةً يُرِيدُ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ وَحَبِطَ عَمَلُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إِذَا أَهْدَى يَوْمُ النَّيْرُوزِ إِلَى مُسْلِمٍ آخَرَ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ تَعْظِيمُ الْيَوْمِ وَلَكِنْ عَلَى مَا اعْتَدَاهُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ خَاصَّةً وَيَفْعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنِّي لَا يَكُونُ تَشْبِيهًا بِأَوْلَئِكَ الْقَوْمِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ رَجُلٌ اشْتَرَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا يَشْتَرِيهِ الْكَافِرَةُ مِنْهُ وَهُوَ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ بِهِ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا تُعْظِمُهُ الْمُشْرِكُونَ كَفَرَ ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالتَّنَعُّمَ لَا يَكْفُرُ (البحر الرائق شرح كتر الدقائق - (ج ٢٥/ص ٥)

এর অর্থ হল এই দুটি দিন উপলক্ষে উপহার আদান প্রদান করা হারাম বরং কুফর। আবু হাফস (রহঃ) বলেন যদি কোন ব্যক্তি ৫০ বছর আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে পরে নওরোজের দিন একজন মুশরিককে একটি ডিমও উপহার দেয় যদি তার উদ্দেশ্য হয় উক্ত দিনকে সম্মান করা তবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। জামিয়ে আসগরের লেখক বলেছেন যদি নওরোজের দিন কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে কিছু উপহার দেয় এবং এর মাধ্যমে উক্ত দিবসকে সম্মান করা উদ্দেশ্য না হয়ে শুধুমাত্র অভ্যাসগত কারণে হয়ে থাকে তবে এটা কুফরি হবে না ঠিকই কিন্তু এমন করা যাবে না বরং উক্ত দিনের আগে বা পরে মুসলিমরা হাদীয়া আদান প্রদান করবে যাতে ভিন্নধর্মালম্বীদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায় কারন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে কেউ যে কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। জামীয়ে আসগারে আছে যদি কোন মুসলিম নওরোজের দিনে এমন কিছু ক্রয় করে যা সে পূর্বে ক্রয় করতনা এবং কাফিররা উক্ত বস্তু ঐদিন ক্রয় করে থাকে যদি সে উক্ত বস্তু ক্রয় করার মাধ্যমে উক্ত দিবসকে সম্মান করা উদ্দেশ্য করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে আর যদি পান করা বা খাওয়া উদ্দেশ্য করে তবে কাফির হবে না। (আল বাহরুর রায়িক খন্ড ২৫ পৃষ্ঠা ৫)

একই কথা হানাফী মাযহাবের অন্য বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে যারা আরবী পড়তে সক্ষম এবং অধিক জানতে আগ্রহী তাদের জন্য আমরা সেগুলোর আরবী ইবারত উল্লেখ করছি অর্থ মোটামুটি একই হওয়ার কারণে তার বাংলা তরজমা করা নিষ্প্রয়োজন।

রুদুল মুখতার :

(وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ) أَيُّ الْهَدَايَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ (وَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَهُ) كَمَا يُعْظِمُهُ الْمُشْرِكُونَ (يَكْفُرُ) قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ أَهْدَى لِمُشْرِكٍ يَوْمَ النَّيْرُوزِ بَيْضَةً يُرِيدُ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ وَحَبِطَ عَمَلُهُ هـ وَلَوْ أَهْدَى لِمُسْلِمٍ وَلَمْ يَرِدْ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ بَلْ جَرَى عَلَى عَادَةِ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ

وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ نَفْيًا لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ شَرَى فِيهِ مَا لَمْ يَشْتَرِهِ قَبْلَ أَنْ أَرَادَ تَعْظِيمَهُ كَفَرٌ وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْلَ كَالشُّرْبِ
وَالْتَّنَعِيمَ لَا يَكْفُرُ زَيْلَعِي (رد المختار - (ج ٢٩/ص ٣٣٨)

দুররুল মুখতার :

(والاعطاء باسم النبروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه
المشركون (يكفر) قال أبو حفص الكبير: لو أن رجلاً عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النبروز بيضة يريد تعظيم
اليوم فقد كفر وحبط عمله ٥٠. ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر، وينبغي أن
يفعله قبله أو بعده نفياً للشبهة، ولو شرى فيه ما لم يشتريه قبل أن أراد تعظيمه كفر، وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم
لا يكفر. زيلعي (الدر المختار - (ج ٧/ص ٣٤٦)

তাবইনুল হাকাইক শারহু কানযিদাকাইক:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ) أَيُّ الْهَدَايَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ بَلْ كُفْرٌ، وَقَالَ أَبُو
حَفْصٍ الْكَبِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ، وَأَهْدَى لِبَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بِيضَةً يُرِيدُ بِهِ
تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إِذَا أَهْدَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ إِلَى مُسْلِمٍ آخَرَ، وَلَمْ
يُرِدْ بِهِ التَّعْظِيمَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَكِنْ مَا اعتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
خَاصَّةً، وَيَفْعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَيْ لَا يَكُونَ تَشْبِيهاً بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ }، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ رَجُلٌ اشْتَرَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ بِهِ تَعْظِيمَ
ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا يَعْظُمُهُ الْمُشْرِكُونَ كَفَرَ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالتَّنَعِيمَ لَا يَكْفُرُ.

تبیین الحقائق شرح کتر الدقائق - (ج ١٨/ص ٣٨٠)

হাসলী মাযহাবের ফকীহ ইবনে কুদামা বলেন ,

افراد يوم النبروز ويوم المهرجان بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفارة فيكون تخصيها بالصيام دون غيرها موافقة لهم
في تعظيمها فكره كيوم السبت وعلى قياس هذا كل عبد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم (المغني - (ج ٣/ص ١٠٥)

নওরোজ বা মেহেরজানের দিন বিশেষ করে রোজা রাখা যাবে না কারন এই দুটি দিবসকে কাফিররা
সম্মান করে। ফলে ঐদিবস দুটিতে রোজা রাখলে কাফিরদের সহিত সামঞ্জস্য হয়ে যায় যেভাবে শনিবার
দিন রোজা রাখা মাকরুহ (কারন এটা ইয়াহুদীদের উৎসবের দিন) এভাবে কাফিরদের যে কোন উৎসবের

দিন বা তারা সম্মান করে এমন দিনে বিশেষভাবে রোজা রাখা যাবে না। (আল মুগনী খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ১০৫)

কিভাবে একজন মুসলিম কাফির হয় সে অধ্যায়ে ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে

وَيُخْرِجُهُ إِلَى نِيَرُوزِ الْمَحْجُوسِ لِمُؤَافَقَتِهِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبِشِرَائِهِ يَوْمَ النَّيَرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلنَّيَرُوزِ لَا لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَيَاهْدَائِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ بِيَضَّةٍ تَعْظِيمًا لِذَلِكَ (الفتاوى الهندية)

এবং (কোন মুসলিম কাফির হবে) যদি সে মাজুসীদের ধর্মীয় উৎসবের দিন তাদের সাথে গমন করে এবং তারা যা করে তা করে অথবা উক্ত দিনের সম্মানের উদ্দেশ্যে এমন কিছু ক্রয় করে যা সে পূর্বে ক্রয় করত না অথবা উক্ত দিনের সম্মানের উদ্দেশ্যে কোন মুশরিককে কোন কিছু উপহার দেয় যদি একটি ডিমও হয়। (49)

ইমাম ইবন তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মুসলিমরা বেধর্মীদের উৎসবের দিন তাদের সহিত সামঞ্জস্য রেখে যা কিছু করে তার বৈধতা সম্পর্কে। এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার বিস্তারিত মন্তব্য মাজমুয়ায়ে ফতওয়াতে উল্লেখিত আছে আমরা এখানে প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করছি।

وَأَمَّا إِذَا أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ قَصْدًا فَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَلَا نَزَاعَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . بَلْ قَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى كُفْرٍ مَنْ يَفْعَلُ هَذِهِ الْأُمُورَ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : مَنْ ذَبَحَ نَطِيحَةً يَوْمَ عِيدِهِمْ فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ حِنْزِيرًا

যদি এসব কাজ মুসলিমরা কাফিরদের উৎসব উপলক্ষেই নই বরং এমনিতেই করে থাকে তবু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কিছু আলেম এটা অপছন্দ করেছেন আর যদি উক্ত উৎসবের দিন উপলক্ষেই এসব করে থাকে তবে তো তা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্যই নেই। বরং কোন কোন আলেম তো একে কুফরী বলে আখ্যায়িত করেছেন যেহেতু (সম্ভবনা রয়েছে যে) এতে কাফিরদের কৃষ্টি কালচারকে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন কাফিরদের উৎসবের দিন যদি কেউ কোন পশু জবাই করে সে যেন সে শুরুর জবাই করল (মাজমুআয়ে ফাতাই)

যদি কাফিরদের দিবসকে সম্মান করা হচ্ছে বলে মনে হয় এমন কোন কাজ করা কুফরী হয় তবে যদি কেউ সরাসরি দাবি করে আমি তাদের ধর্ম ও উপাস্যাদিগকে সম্মান করি তবে তার ঈমানের অবস্থা কি হবে!

وَقَالُوا : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْعُوا لِلنَّصَارَى شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِمْ لَا لَحْمًا وَلَا دَمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ دَابَّةً وَلَا يَعَاوُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ شِرْكِهِمْ وَعَوْنِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَيَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَنْهَوْا الْمُسْلِمِينَ

عَنْ ذَلِكَ . لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } . ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَأَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى شَرْبِ الْخُمُورِ بِعَصْرِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . فَكَيْفَ عَلَى مَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْكُفْرِ . وَإِذَا كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعِينَهُمْ هُوَ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আলেমরা বলেছেন কোন মুসলিমের জন্য জায়েজ নই যে, খৃষ্টানদের উৎসবের দিন তারা যেসব বস্তু ব্যবহার করে তা খৃষ্টানদের নিকট বিক্রি করে যেমন রক্ত, মাংস, পোশাক ইত্যাদি তাদের নিকট কোন বাহনও ভাড়া দেবেনা কেননা এতে তাদের শিরককে সম্মান দেখানো হয় এবং তাদের কুফরী করতে সাহায্য করা হয় মুসলিম বাদশাদের উচ্চ মুসলিমদের এসব থেকে নিষেধ করা কেননা আল্লাহ (ﷻ) বলেন

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }

তোমরা ভাল কাজে একে অপরের সহযোগীতা করো আর পাপ কাজে একে অপরের সহযোগীতা করো না। (মায়দা - ২)

একজন মুসলিমের জন্য তো মদ তৈরী করে কোন কাফিরকে তা খেতে সাহায্য করা জায়েজ নেই তাহলে কিভাবে কুফরী কাজ সমুহতে তাদের সাহায্য করা বৈধ হতে পারে (অথচ মদ পান করার চেয়ে শিরক কুফর বেশি জঘন্য অপরাধ) যখন এসব কাজে তাদের সাহায্য করারই অনুমতি নেই কেমন হবে যদি মুসলিমরা নিজেরাই এসব কাজ শুরু করে দেয়?

(মাজমুউল ফাতাই)

যেসকল মুসলিম যুবকেরা হিন্দু বন্ধুদের সাথে পুজার সময় উৎসবে মেতে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে নাচানাচি করে তাদের ঈমানের অবস্থা একবার চিন্তা করুন। যেসকল নেতা নেত্রীরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করার পরও গনতন্ত্রের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গির্জা বা মন্দিরে পূজা অর্চনাতে হাজিরা দেন তাদের দাবিকৃত পদবী আজগুবী বৈ কি! মনে রাখতে হবে, কাফিরদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও কৃষ্টি কালচারকে সম্মান প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ ঈমান বিধ্বংসী কাজ। আশা করি নিজেদের গনতান্ত্রিক প্রমাণ করার জন্য এধরনের মহা ফাপড়ে পা রাখা হতে বিরত থাকবেন। কিভাবে মুসলিমরা শিরক কুফর ও পাপের কাজ সমুহকে সম্মান করবে আথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

[الحجرات/১]

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা শোভনীয় করে দিয়েছেন আর তোমাদের নিকট ঘৃণিত করে দিয়েছেন কুফর, ফিসক ও পাপ কাজকে। এরাই সত্যপথ প্রাপ্ত। (সূরা হুজুরাত/৮)

<# অমুসলিমদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার #>

৩ . গণতন্ত্র বলে, নিজ ধর্ম স্বাধীন ভাবে পালন করা অমুসলিমদের অধিকার। আমরা পূর্বেই বলে এসেছি এ ধরনের অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। আল্লাহর জমিনে বাস করে, আল্লাহর দেওয়া রিযিক ভক্ষন করে তারই সাথে শিরক করার অধিকার দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপনার বুকে বসে চোখে ঠোকর মারার অধিকার কাউকে দেবেন কি? আপনি দিলেও দিতে পারেন কারন আপনি মানুষ, আপনার আকল বুদ্ধি অপরিপক্ক ও অপূর্ণ কিন্তু মহাবিশ্বের রব এমনটি করতে পারেন না। ইসলাম কুফরীকে নির্মূল করতেই চায়। কখনও তো তরবারি দ্বারা তার মূল উৎপাতন করে, কখনও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে অসুস্থ হৃদয়কে সুস্থ করার চেষ্টা করে। জিজিয়া হল সেই মানসিক চাপ। ব্যাপারটি আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করেছি। আমরা সেখানে বলেছি জিজিয়া কর দেওয়ার পরও ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজারা প্রকাশ্যে নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ পাবে না তাদের কুফর শিরকের প্রচার করতেও দেওয়া হবে না। আর ইসা (ﷺ) আসলে সমস্ত কাফিরকে এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে এখনও হিন্দু বৌদ্ধদের আর হানাফী মাযহাব মতে আরব মুশরিকদের নিকট জিজিয়া কর গ্রহন করা হবে না বরং তাদের তরবারী দ্বারা ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য করা হবে। ইসলাম গ্রহন না করলে হত্যা করা হবে। অতএব ইসলাম অমুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকারে বিশ্বাসী নই তবে কখনও কখনও নিজ ইচ্ছা অনুসারে কিছুটা সুযোগ দেয়, কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে ইচ্ছা করলে তরবারী ছাড়া অন্য কোন সুযোগই দেয়না। যখন সুযোগ দেয় তখনও কিছু বাধানিষেধ অবশিষ্ট রাখে এবং উদ্দেশ্য হয় কাফিরদের উপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করে মুসলিম হতে বাধ্য করা। এসব বিষয়ে আমরা যুক্তি প্রমানসহ পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।

<# অমুসলিমদের মুসলিম হতে বাধ্য করা কি অন্যায়? #>

৪ . গনতন্ত্রের আর একটি শিক্ষা হল অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য করা যাবে না। কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা আগে আক্রমণ করতে পারবে না। ইসলাম এধরনের নীতিবাক্যের প্রতি নত নয়। মক্কাবিজয়ের পর মক্কার মুশরিকদের চার মাস সময় দেওয়া হয়েছিল পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল চার মাসের মধ্যে মুসলিম না হলে তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। সুরা তাওবাতে এবিষয়ক নির্দেশ নাযিল হয়েছিল। এ কারনে ইমাম আবু হানীফার মত এখনও আরব মুশরিকদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহন করা হবে না বরং তাদের মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান এবং মাজুসী তথা অগ্নিপূজক ছাড়া অন্য সকল কাফিরদের মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে। সে হিসাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য করা যায়। যদি কোন মুসলিম খলীফা এমন করেন সেটা অগনতাত্ত্বিক হবে বটে কিন্তু অনৈসলামিক হবে না কারন কোন বিষয়ে দুটি মাযহাবের যা রায় তার অনুসরণ করা পুরোপুরি জায়েজ। ইসা (ﷺ) আসার পর জিজিয়া নেওয়া পুরোপুরি পরিত্যাগ করবেন তখন ইয়াহুদী খৃষ্টান সহ সমস্ত

কাফিরদের মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে। যারা মনে করেন কাফিরদের কুফরির উপর স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত তারা বলবেন কি, মুরতাদকে কেন হত্যা করা হয়? মুরতাদ মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে একারণে হত্যা করা হয়, নাকি ঈমান গ্রহণের পর কাফির হওয়ার কারণে হত্যা করা হয়? আসলে কাফিররা হত্যারই যোগ্য কিন্তু ইসলাম কোন কোন কাফিরকে হত্যা না করে কিছুকাল সুযোগ দিচ্ছে যাতে সে মুসলিম হয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বর হতে নিজেকে বাচাতে পারে। যে কাফিরকে তার কুফরির কারণে হত্যা করা হচ্ছে ওটাই তার যোগ্য শাস্তি আর যাকে কিছুকাল অবকাশ দেওয়া হচ্ছে ওটা তার উপর আমাদের অনুগ্রহ মাত্র। আপনি কি দেখেন না কিভাবে একজন জেনাকারী বিবাহিত মেয়েকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়? শিরক কুফর তো জিনার চেয়েও ভয়াবহ পাপ তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে অবাক হওয়ার কি আছে! যে পাপের কারণে চিরকাল জাহান্নামের অসহ্য শাস্তি ভোগ করতে হয় সেই অপরাধে দুনিয়াতে কাউকে তরবারী আঘাতে হত্যা করা হবে এতে যারা আশ্চর্য বোধ করেন তাদের বোধ শক্তি যে কতটা বিকারগ্রস্ত আশাকরি তা বুঝতে পারছেন।

এটাও পূর্বে গত হয়েছে যে, কাফিরদের আগে আক্রমণ করা মুসলিমদের উপর ফরজ। যেভাবে সুলাইমান (عليه السلام) সাব্বা রাষ্ট্রের উপর আগে আক্রমণ করেছিলেন। আল্লাহর জমিনে কোন কাফির রাষ্ট্রকে মুসলিমরা টিকে থাকতে দেবে না। ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি কাফিরকে মুসলিমদের পক্ষ থেকে আরোপিত শর্তের অধিনে দারুল ইসলামে বসবাস করতে হবে।

<# গনতন্ত্রের আর একটি শিক্ষা হলো, কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা যেমন শাসন ব্যবস্থা চাই সেটাই মেনে নিতে হবে যদিও তা অনিসলামী হয়। #>

৫ . কোন একটি ভূখন্ডের অধিবাসীদের বেশিরভাগ লোক যেমন শাসন ব্যবস্থা চায় সেধরনের শাসন ব্যবস্থাই সেখানে চলবে। তরবারীর জোরে ক্ষমতা দখল করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। যদি ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতেই হয় তাহলে অবশ্যই উক্ত ভূখন্ডের অধিকাংশের সমর্থনেই তা করতে হবে। এটা উক্ত ভূখন্ডের অধিবাসীদের গনতান্ত্রিক অধিকার। মদীনাতে প্রতিষ্ঠিত রসুলুল্লাহর (ﷺ) এর রাষ্ট্রটি গনতান্ত্রিক ছিল না কারন মদিনার মুসলিমদের সংখ্যা ইয়াহুদী ও পৌত্তলিক মুশরিকদের সম্মিলিত সংখ্যার তুলনায় বহুগুণে কম ছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি কিভাবে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ ব্যাতিরেখেই একতরফাভাবে রসুলুল্লাহকে রাষ্ট্রনায়ক ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এমন ছাড়া আর কিই বা হওয়ার ছিল? মদিনার প্রেসিডেন্ট কে হবে এ বিষয়ে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতার বা অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে আলোচনাতে বসে পর্যালোচনা করাটা নিশ্চয় গণতন্ত্র সম্মত কিন্তু কোন মুসলিম এটা কল্পনা করলেও হাসবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) নেতা হবেন কিনা এ বিষয়ে কাফিরদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যতই গণতন্ত্র সম্মত হক ইসলামী মূল্যবোধের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। হিজরতের পর যে অপছন্দ করে তার অপছন্দ সত্ত্বেও মুসলিমরা মদীনাতে ইসলামী আইন চালু করেছিল। একই ইতিহাস ঘটেছে রোম, পারস্য, মিশর, স্পেন, সারা দুনিয়ায়।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [التوبة/ ٣٣]

তিনি হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে তার রসুলকে প্রেরন করেছেন যাতে করে তিনি এ দ্বীনকে অন্য সমস্ত দিনের উপর বিজয়ী করতে পারেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।⁽⁵⁰⁾

ইসলামী আইনকে যে কেউই অপছন্দ করে সে মুশরিক। মুশরিকরা অপছন্দ করলে তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুকাল অপেক্ষা করা নই বরং তাদের অপছন্দ সত্ত্বেও এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্যই রসুলের আগমন। অথচ কি আশ্চর্য যে এ দ্বীনকে পরিত্যাগ করে এখন মুসলিমদের গনতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী করা হচ্ছে। মুসলিমদের শেখানো হচ্ছে কোন আইনে দেশ চলবে তা দেশের অধিবাসীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দেশের অধিবাসীরাই কি দেশের মালিক না কি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তার সৃষ্ট জমিনে অনুগ্রহ করে যাদের বসবাস করতে দিয়েছেন তাদের ইচ্ছানুযায়ী আইন চলবে নাকি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী? জমির মালিকের সাথে জমির অধিকার নিয়ে ভোটভোট! উদ্ভট নই কি?

<# ভেজাল গণতন্ত্র #>

আমরা এতক্ষন যা বর্ণনা করলাম এটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। গণতন্ত্র বলতে মানুষ এধরনের মতবাদকেই বোঝে, এর বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে অগনতান্ত্রিক বলে গালি দেয়। এই গালি পরিমাণ ও তীব্রতায় এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সংখ্যক তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চিন্তায় ভীষন ভাবে চিন্তিত। তারা পড়েছেন উভয় সংকটে। না পারছেন গণতন্ত্রকে পুরোপুরি মেনে নিতে আর না পারছেন ইসলামকে ছেড়ে দিতে। এ কাদা জল থেকে বের হওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে পরিশ্রম করে তারা এক উদ্ভট সামাধান আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে একেবারে রাক্ষস রাজ্য থেকে তারা হাজীর করেছেন এক অতি আশ্চর্য মতবাদ। যার কল্যাণে একজন মুসলিম একই সাথে মুসলিম ও গনতান্ত্রিক উভয় পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে পারবেন। সত্যিই খুবই চমৎকার ব্যাপার! অতদূর থেকে অত কষ্ট করে আমদানি করা অষ্টমাশ্চার্যটি নিজে চোখে দেখার সাধ কার না জাগে। আমরাও একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই নিজেকে গনতান্ত্রিক প্রমাণ করার ইসলাম সম্মত উপায়টি ইসলামের উসুল মতে আদৌ গ্রহনযোগ্য কিনা।

<# “ইসলামী গণতন্ত্র” এবং এর নামকরণ প্রসঙ্গে কিছু কথা #>

প্রথমেই আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি বহু সংখ্যক পণ্ডিত কোরআন হাদীসের উপর বিরতিহীন গবেষণা চালিয়ে যে মতবাদটি আবিষ্কার করেছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্র, পুরোপুরি পণ্ডিতদের ভাষায় বললে “ইসলামী গণতন্ত্র”।

(50) তাওবা ৩৩ ও সফ ৬১

একজন সুখী কৃষকের একটি দুঃখের গল্প আছে। দু জোড়া হালের গরু দিয়ে ১০/১৫ বিঘা জমি চাষ করে প্রায় রাজার হালে তার জীবন চলত। সুখ সাচ্ছন্দে কানায় কানায় ভর্তি জীবনে একটি মাত্র দুঃখ ছিল। ছায়েরা খাতুনের সাথে বিবাহ করার ১৫ বছর পরও কোন সন্তানের মুখ দেখার ভাগ্য তার হলনা। হঠাৎ ছায়েরা খাতুন গর্ভবতী হলেন। কৃষকের খুশি দেখে কে! সে খুশি পাহাড় সমান হয়ে গেল যখন ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখে ছায়েরা খাতুন পূর্ণিমার চাদের মত সুন্দর একটি মেয়ে প্রসব করলেন। আনন্দে হিতাহিত জ্ঞান হারানো কৃষক তার নাম রাখলেন ভেদা। ভাদ্র মাসে জন্মেছে তাই তার নাম ভেদা। এটা কোন যৌক্তিক কথা হল না। ভাদ্র মাসে জন্মানোটা এমন কোন বড় অপরাধ নই যার কারনে কাউকে এমন কুৎসিত নাম দিতে হবে। তবু আনন্দের অতিশয়ে কৃষক এই অযৌক্তিক কাজটি করে ফেললেন। অনেক পরে হলেও তাকে এই ভুলের খেসারতও দিতে হয়েছিল। বয়স হলে যখন প্রানপ্রিয় কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করছিলেন তখনই একটি ভাল সম্মন্ধ আসল। ছায়েরা খাতুনের বাবার বাড়ির এলাকা হতে এক টাকাওয়ালা পরিবার কৃষকের মেয়েকে দেখতে আসল। মেয়ে দেখে তাদের নিশ্চয় পছন্দ হয়েছিল, অত সুন্দরী মেয়ে পছন্দ না হয়ে যায় কোথায়! কিন্তু মেয়ের নাম শুনার পর থেকে তারা আর দেখা করেনি। ছেলে পক্ষ ভেদার নাম শুনেই তার রূপগুন সব ভুলে গেল।

একটা সুন্দর জিনিসের জন্য একটা সুন্দর নাম যে, কত গুরুত্বপূর্ণ তা কেবল ভেদার মত ভুক্ত ভোগিরাই জানে। নামেই বস্তুর পরিচয়। আল্লাহ বলেন

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البقرة/ ৩১]

আল্লাহ আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন (বাকারা/৩১)

নাম শিক্ষা দিলেন অর্থ উক্ত বস্তুর পরিচয় শিক্ষা দিলেন। এই নাম শিক্ষা দেওয়ার কারনেই আদম (عليه السلام) ফেরেসাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিলেন। একজন দক্ষ লেখক একটা ভাল প্রবন্ধের জন্য অবশ্যই একটি ভাল শিরনাম চয়ন করবেন। শিরনাম আকর্ষনীয় না হলে বহু পাঠকই লেখার অভ্যন্তরে প্রবেশের আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন। শিরোনাম বা নাম কোন বস্তুর উপরের মোড়কের মত। আপনি যদি খুশির দিন বন্ধুকে তৈলাক্ত তেনা দিয়ে মোড়ানো একটি রূপার অলংকার পুরস্কার দেন তবে অলংকারটি পেয়ে আপনার বন্ধুর মনে যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাওয়ার কথা তৈলাক্ত তেনাটি তাতে কিছু না কিছু ভাটা ফেলবেই।

সম্মানিত চিন্তাবিদদের প্রস্তাবিত ইসলামী গনতন্ত্রের অভ্যন্তরভাগে কি কি অসঙ্গতি আছে তা আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু এত কষ্টার্জিত বস্তুটির নাম গণতন্ত্র রাখাটা কতটুকু ইসলাম সম্মত সেটাই আগে জেনে নেওয়া ভাল।

ধরুন পাশ্চাত্য প্রভাবিত কোন একটি রাষ্ট্রে আপনার এক মুসলিম বন্ধু স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। দেশটির সংস্কৃতিই এমন যে, মদ পান না করলে মান থাকে না। এদিকে বন্ধুটি নিজেই ইসলামী মানসিকতা সম্পন্ন মনে করে। সে যে মদ পান করে না বিষয়টি জানাজানি হলে তার পরিচিত মহলে তাকে নিয়ে বিভিন্ন গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় কেউ কেউ তো সামনেই তিরস্কার করে বসে। উদ্ভূত

পরিস্থিতিতে সে এক অভিনব সামাধান বের করে ফেলে। আখের গুর, লবন আর পানি মেশালে যে হালাল পানীয়টি তৈরী হয় তার নাম রাখে মদ। বিভিন্ন বন্ধু মহলে প্রচার করতে শুরু করে আমি ইসলামী মদ পান করি। তার পানীয়টি বৈধ হলেও উক্ত বৈধ পানীয়টি মদ নামে আখ্যায়িত করা তিনটি কারনে অবৈধ।

১ . প্রথমত সে কাফিরদের দারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদের সম্ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে। আর এটা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে কেউ যে কোন সম্প্রদায়কে অনুসরন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে।⁽⁵¹⁾

আল্লাহ বলেন,

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ [المائدة/ ৫৪]

তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। (মায়েরা ৫৪)

عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم

হযরত উবাদা ইবন সামিত বলেন আমরা আল্লাহর রসুলের হাতে বায়াত হয়েছিলাম এই শর্তে যে, আমরা পছন্দ হক আর না হক আমীরের আনুগত্য করব নেতৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি করব না আর যোখানেই থাকি হকের উপর টিকে থাকব বা হক কথা বলব আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করব না।⁽⁵²⁾

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

(أقيموا حدود الله في القريب و البعيد . ولا تأخذكم في الله لومة لائم)

দুরে বা কাছে যেখানেই হক আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করো আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে যেন কোন নিন্দাকের নিন্দা তোমাদের প্রভাবিত না করে।⁽⁵³⁾

অতএব কাফিরদের নিকট মুখ রক্ষার জন্য তাদের ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করা পুরোপুরি না জায়েয।

(51) আবু দাউদ, মিশকাত আলআলবানী বলেছেন হাসান সহীহ

(52) বুখারী ও মুসলিম

(53) ইবন মাযা, মুস্তাদরাকে হাকিম, আলবানী বলেছেন হাসান

২ . আপনার বন্ধুটি দুই নম্বর যে অপরাধ করেছে তা এই যে, সে একটা বৈধ ও হালাল জিনিসকে হারাম নাম দিয়েছে। আব্বাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা বলেন,

بُئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ [الحجرات/ ১১]

ইমান আনয়ন করার পর মন্দ নাম ব্যবহার করা খুবই জঘন্য⁽⁵⁴⁾

৩ . বৈধ জিনিটিকে অবৈধ নাম দেওয়ার কারনে আস্তে আস্তে অবৈধ জিনিসটিই চালু হয়ে যাবে। আর সেটির প্রথম চালু করার কারণে পরবর্তীতে তার উপর আমল কারী সকলের গোনার ভার উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাবে। যেমনটি রসুলুল্লাহ বলেন,

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا،

যে কেউ ইসলামের মন্ধে কোনো খারাপ রীতি নীতি চালু করে তার পরে যতলোক সেটার উপর আমল করে তাদের পাপের সমান পাপ তার আলমনামাতে লেখা হয়।⁽⁵⁵⁾

(সহীহ মুসলিম)

যেভাবে আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যারাই ইসলামী গনতন্ত্রের প্রস্তাব দিয়েছেন তারা আস্তে আস্তে পাশ্চাত্যের প্রকৃত গনতন্ত্রের ভিতর বিলিন হয়ে যাচ্ছেন।

অতএব যখন আপনারা স্বীকারই করেন যে, পাশ্চাত্য প্রস্তাবিত গনতন্ত্রের মধ্যে শিরক ও কুফর রয়েছে তবে তাদের ব্যবহৃত নাম নিজেদের প্রস্তাবিত মতবাদের জন্য কেন ব্যবহার করছেন? গরুর মাংস শুকরের চামড়ায় জড়িয়ে রাখা জায়েজ মনে করেন কি? নিজের জিনিস নিজের ব্রিফকেসে রাখাটায় অধিক নিরপদ নই কি? যদি আপনাদের আবিস্কৃত মতবাদ এতটাই নতুন হয়ে থাকে যে, ইসলামের ইতিহাসে তার কোন পূর্ব নাম না পওয়া যায় তবে আরবী জানে এমন একজন লোক আরবী অভিধান ঘেটে আপনাদের ইসলামী গনতন্ত্রের জন্য একটা ইসলামী নাম দিলে কি ভাল হত না? এসবেরও কোন দরকার ছিল না কারন ইসলামের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত নীতিমালার নাম চার ইমাম বা কোন বরেণ্য আলেম নয় স্বয়ং রসুলুল্লাহ নিজে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مَلِكٌ

আমার পর খিলাফত (ইসলামী শাসন নীতি) থাকবে ৩০ বছর তার পর শুরু হবে রাজতন্ত্র⁽⁵⁶⁾

(54) হুজুরাত ১/১১

(55) সহীহ মুসলিম/باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة/كتاب العلم

(56) তিরমিযী, আলবানী সহীহ বলেছেন

অন্য একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا شَاءَ ، ثُمَّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا

তোমাদের মধ্যে আল্লাহ যতদিন চান নবুওত থাকবে তারপর আল্লাহ (নবী ﷺ) এর ওফাতের মাধ্যমে) নবুওত তুলে নেবেন। তারপর নবীর অনুসরণে খিলাফত থাকবে আল্লাহ যতদিন চান পরে আল্লাহ তাও তুলে নেবেন তার পর হবে রাজতন্ত্র . . . (57)

সুতরাং নবীর অনুসরণে সঠিক ইসলামী শাসন পদ্ধতিকে আল্লাহর রসুল (ﷺ) নিজে খিলাফাহ (فلاحة) নামকরণ করেছেন আপনাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি যদি সত্যিই পুরোপুরি ইসলাম সম্মত হয়ে থাকে তবে তার জন্য রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র মুখ হতে নিঃস্বরিত নাম ব্যবহার না করে অন্য কোন নাম ব্যবহারের স্পর্শ কোথায় পেলেন? আপনাদের প্রশ্ন করতে পারি কি নবুওতী ধারার অনুসরণে যে ব্যবস্থাকে ইসলাম খিলাফাহ নাম করন করেছে তার সাথে আপনাদের প্রস্তাবনার ঠিক কি কি পার্থক্য রয়েছে যার কারণে আপনারা “খিলাফাহ” নামের পরিবর্তে “ইসলামী গণতন্ত্র” ব্যবহার করছেন? আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, আপনাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি যতই ইসলাম সম্মত হক তার নাম হিসাবে খিলাফাতের পরিবর্তে গণতন্ত্র ব্যবহার করে আপনারা গণতন্ত্রের প্রচার প্রসারে সহযোগীতা করছেন, ইসলামী খিলাফতের ধারণা জনমন হতে মুছে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন, জনগনকে বিভ্রান্তিতে ফেলছেন। শুধু গণতন্ত্র নাম ব্যবহার করার কারনেই আপনারা শত অপরাধে অপরাধী।

<# কিছু মিল থাকলেই কি একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর নামে ডাকা যায়? #>

ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থাকে যারা গণতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করেন তারা অনেক কষ্ট কসরত করে গণতন্ত্রের সাথে খিলাফতের বিল খুজে পাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের দেখানো মিলগুলো যে অগ্রহণযোগ্য তা আমরা সামনে আলোচনা করেছি কিন্তু কথা হল কিছু মিল থাকলেই কি একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর নামে ডাকা যায়? যেমন যদি কেনা হিন্দু বলে- ইসলামে ১০ % হিন্দুইজম রয়েছে কারন হিন্দু ধর্ম চুরি, মিথ্যা বলা, জুলুম নির্যাতন করা ইত্যাদি নিষেধ করে ইসলাম ধর্মও এগুলো নিষেধ করে।

তার এই কথা কতটুকু অগ্রহণযোগ্য হবে? এধরনের মিল থাকার কারনেই কি একজন মুসলিম নিজেকে হিন্দু বা খৃষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারে অথবা ইসলামী হিন্দু নীতি বা ইসলামী খৃষ্টানিটি জাতীয় কোন মতবাদ আবিষ্কার করা যায়? সোজা কথা হল কিছু মিল থাকলেই ইসলামী কোন ব্যবস্থাকে কুফরী নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। খিলাফতকে গণতন্ত্র বলা যাবে না, নিজেদের গণতান্ত্রিকও বলা যাবে না। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থার বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিন কোনো মিল খুজে

(57) মুসনাদে বাজ্জার

পাওয়া যায় না। আমরা নিচে সে বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

<# গণতন্ত্র ও খিলাফতের মধ্যে পার্থক্য #>

এখন আমরা প্রস্তাবিত ইসলামী গণতন্ত্র আর নবুওতী ধারার খিলাফতের মধ্যকার অসঙ্গতি সংক্রান্ত আলোচনাতে মনোনিবেশ করতে চাই।

গণতন্ত্র বলে, “সকল ক্ষমতার উৎস জনগন” এই কথাটিকেই অন্যভাবে বলা হয় জনগনই একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। রাষ্ট্রের শাসক কে হবে, কোন আইনে বিচার হবে ইত্যাদি গুরুতর বিষয় বেশিরভাগ জনগনের খেয়াল খুশি অনুযায়ী সামাধা করা হবে এটাই গণতন্ত্র। স্পেনে বেশির ভাগ লোকের সমর্থনের সমকামীতা বৈধ হওয়া, বিভিন্ন দেশে অধিকাংশের ভোটে গর্ভপাত আইন সম্মত হওয়া গণতন্ত্রের কুৎসিত রূপ প্রকাশ করে। যেহেতু এ বিষয়ে প্রতিটি মুসলিম নরনারী জ্ঞাত যে, সকল ক্ষমতার উৎস জগনগন এমন কথা কল্পনা করলেও ঈমান হারা হতে হয় তাই ইসলামী গণতন্ত্রের প্রস্তাবকদের জনগনের সার্বভৌমত্বকে প্রথমেই অস্বীকার করতে হয়েছে। তাদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী আইন প্রণয়নে জনগনকে কোন অধিকার দেওয়া হবে না। জনগনের অধিকার কেবল শাসক নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংবিধান হবে কোরআন এবং কোরআনের আইন অনুযায়ী বিচার কার্য চলবে কিন্তু খলীফা বা পেসিডেন্ট কে হবে এটা জনগনের ভোটে ঠিক করা হবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর জনগনকে খলীফা পরিবর্তনের অধিকার দেওয়া হবে। খলীফা ক্ষমতা থাকাকালীন পার্লামেন্টের সদস্যদের (প্রস্তাবকদের দাবী অনুযায়ী মজলিসে শুরার সদস্যদের) বেশির ভাগের মতামত মানতে বাধ্য থাকবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রস্তাবিত ইসলামি গণতন্ত্রে তিনটি মূল বিষয় রয়েছে

১ . খলীফা হবেন কেবল মাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসীর সমর্থনে। এছাড়া অন্য কোন ভাবে ক্ষমতায় আসা বৈধ বিবেচ্য হবে না।

২ . ক্ষমতায় আসার পর হতেই খলীফা শুরা কমিটির সদস্যদের দারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। শুরা কমিটির সদস্যদের অধিকাংশের যা মত তা মানতে তিনি বাধ্য থাকবেন।

৩ . নির্দিষ্ট সময় যেমন পাচ বছর বা দশ বছর পর পর জনগনের আবার পুনঃনির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে।

উপরের যে তিনটি নীতিমালা বর্ণনা করা হল তার একটিও যদি বাদ যায় তবে সেই ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই গণতান্ত্রিক বলা যায় না। উপরে উল্লেখিত তিনটি পয়েন্টের প্রথমটিতে খলীফার ক্ষমতায়ন দ্বিতীয়টিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর তার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আর শেষেরটিতে নির্দিষ্ট সময় পর খলীফাকে অপসারণের নিতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এখন উক্ত তিনটি পয়েন্টে ইসলামের রায় কি তা দলীল প্রমানসহ বর্ণনা করব। ইনশাআল্লাহ এতে পাশ্চাত্য প্রভাবিত কিছু চিন্তাবিদেদর চৈতন্য ফিরবে।

<# খলীফার ক্ষমতায়ন #>

১ . ক্ষমতায়ন

আল মাওরুদী বলেন,

وَالْإِمَامَةُ تُنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ . وَالثَّانِي بِعَهْدِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلُ

খলীফার ক্ষমতায়ন দুইভাবে সম্ভব হয়

১ . আহলুল হিল ওয়াল আকদ (মুসলিমদের মধ্যকার জ্ঞানী ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি বর্গ) এর সম্মতিক্রমে ।

২ . পূর্ববর্তী খলীফার নির্দেশক্রমে⁽⁵⁸⁾

ইমাম আননাব্বী বলেন,

وَأَجْمَعُوا عَلَى انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلَفِ الْخَلِيفَةُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْرِ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسُّتَةِ

আলেমদের ইজমা যে, পূর্ববর্তী খলীফার নিয়োগের মাধ্যমে কেউ খলীফা হতে পারে আহলুল হিল ওয়াল আকদ এর সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারেও কেউ খলীফা হতে পারে যদি পূর্ববর্তী খলীফা কাউকে নিয়োগ না দিয়ে যান । আরও ইজমা হয়েছে যে পূর্ববর্তী খলীফা নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির মধ্য হতে পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করার নির্দেশ দিতে পারেন যেভাবে উমর (رضي الله عنه) ৬ জন ব্যক্তিকে ঠিক করে দিয়েছিলেন ।⁽⁵⁹⁾

ইমাম নাব্বীর এ কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি তিনটি পদ্ধতির কথা বলছেন,

১ . পূর্ববর্তী খলীফার নির্দেশে

২ . আহলুল হিল ওয়াল আকদের সম্মতিক্রমে

৩ . পূর্ববর্তী খলীফা নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে ঠিক করে দিয়ে যাবেন আহলুল হিল ওয়াল আকদ তাদের মধ্য হতে একজনকে বাছায় করে নেবে ।

২ নং ও ৩নং পদ্ধতিকে আলমাওরুদী এক সাথে বর্ণনা করেছেন ফলে তার কথার সাথে আননাব্বীর কথার কোন বিরোধ নেই ।

<# পূর্ববর্তী খলীফার পক্ষ হতে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে যাওয়া #>

(58) আলআহকাম আসসুলতানিয়াহ

(59) ইমাম আননাব্বীকৃত মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা

লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক কাউকে খলীফা মনোনীত করা সম্পূর্ণ বৈধ ও আইন সম্মত হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে ইমাম আননাব্বী বলেন,

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ

আলেমরা ইজমা করেছেন যে পূর্ববর্তী খলিফা যাকে মনোনয়ন দেবেন তাকে মেনে নিতে হবে।⁽⁶⁰⁾

আলমাওরুদী বলেন,

وَأَمَّا انْعِقَادُ الْإِمَامَةِ بَعْدَهُ مَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ مِمَّا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ جَوَازِهِ وَوَقَعَ الْإِتِّفَاقُ عَلَىٰ صِحَّتِهِ لِلْأَمْرَيْنِ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَنَكَرُواهُمَا

أَحَدُهُمَا : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهْدَ بِهَا إِلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَثَبَتِ الْمُسْلِمُونَ إِمَامَتَهُ بَعْدَهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهْدَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِ الشُّوْرَىٰ فَقَبِلَتِ الْجَمَاعَةُ دُخُولَهُمْ فِيهَا وَهُمْ أَعْيَانُ الْعَصْرِ اعْتِقَادًا لِصِحَّةِ الْعَهْدِ بِهَا وَخَرَجَ بَاقِي الصَّحَابَةِ مِنْهَا

পূর্ববর্তী খলীফার নিয়োগের মাধ্যমে কারও নেতৃত্ব বাধ্যতামূলক হওয়ার বৈধতার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়ে গেছে। এবিষয়ে সকলে একমত হয়েছে মূলত দুটি ঘটনার কারণে। মুসলিমরা সে দুটি ঘটনাকে গ্রহণ করেছে এবং সে বিষয়ে মতপার্থক্য করেনি।

১ . হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) হযরত উমরকে খলীফা নিয়োগ করে যান এবং মুসলিমরা তার নির্দেশের কারনেই উমরের খিলাফত মেনে নিয়েছিল

২ . হযরত উমর (رضي الله عنه) ৬ জন ব্যক্তিকে ঠিক করে দিয়েছিলেন সাহাবারা উক্ত ছয় জনকেই মেনে নিয়েছিলেন এবং বাকি সাহাবারা খেলাফতের দাবি হতে সরে এসেছিলেন।⁽⁶¹⁾

এ দুটি ঘটনাই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।⁽⁶²⁾

বুখারীতে বর্ণিত হাদিসটি এই

(60) শারহে মুসলিম লিননাব্বী

(61) আহকামুস সুলতানিয়াহ

(62) হযরত আবু বকর কর্তৃক উমরকে নিয়োগ দেওয়ার হাদীস বুখারী কিতাবুল আহকাম বাবুল ইস্তিখলাফ, মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ বাবুল ইস্তিখলাফ ওয়া তারকুহ আর উমর কর্তৃক ৬ জনকে ঠিক করে যাওয়ার ঘটনা বুখারী কিতাবুল ফাদাইল বাবু কিস্সাতিল বায়আতি ওয়ালা ইত্তিফাক আল উসমান ইবন আফ্ফান (رضي الله عنه)

قيل لعمر ألا تستخلف ؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني

উমর (রাঃ) কে বলা হল আপনি কি পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করবেন না? তিনি বললেন যদি আমি তা করি তবে করতে পারি কারন আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (আবু বকর) তা করেছেন আর যদি তা না করি তবে নাও করতে পারি কারন আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রসুলুল্লাহ ﷺ) তা করেন নি।

বুখারীতে এও বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (ﷺ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আবুবকরকে নিয়োগ করে যায় কারন আমার ভয় হয় যে কেউ হয়তো খিলাফতের ব্যাপারে লোভ করবে কেউ হয়তো এ বিষয়টি দাবি করে বসবে কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হয় যে, আল্লাহ বিষয়টি রক্ষা করবেন এবং মুমিনরা আবুবকর ছাড়া কাউকে মেনে নেবে না।⁽⁶³⁾

রসুলুল্লাহ কাউকে নিয়োগ দিয়ে যাননি এ বিষয়টি ফলাও করে প্রচার করা হয় কিন্তু তিনি যে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন তা মনে রাখা হয় না। রসুলুল্লাহ (ﷺ) যা করতে চেয়েছেন তা অবশ্য বৈধ।

মনে রাখতে হবে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি তথা পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে যাওয়া ইসলামে বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি ইসলামী গনতন্ত্রের প্রস্তাবকদের গলার কাটা স্বরূপ। কারন এটা তাদের সমস্ত প্রস্তাবনাকে নাকচ করে দেয়। কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে এর বৈধতা ইজমা দারা প্রমানিত এবং সহীহ হাদীস দারা স্পষ্ট সমর্থিত সুতরাং আব্রাহাম লিংকনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ থেকে দূরে সরে গেলে চলবে না। তারা অবশ্য পেশাদার তর্কিকের মত বিভিন্ন যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে বিষয়টি ঘোলাটে করে ফেলার চেষ্টা করেন। তারা বলেন আবুবকর (রাঃ) বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাথে পরামর্শ করে যখন বুঝতে পারলেন বেশিরভাগ লোকের সমর্থন উমর (রাঃ) এর পক্ষে তখন তিনি তাকে নিয়োগ করে যান। কি মজার ব্যাপার একবার চিন্তা করুন। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে নির্বাচনের একদিন আগেও নিশ্চিত করে বলা যায় না কে বেশি ভোট পাবে আর আবু বকর (রাঃ) নাকি কয়েকজন সাহাবার সাথে পরামর্শ করেই বুঝে ফেললেন উমর (রাঃ) পক্ষেই জনমত ভারি। দেড় হাজার বছর পূর্বে আবুবকর (রাঃ) এমন কি নিখুত মাপযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। আমি এসকল তর্কিকদের অনুরোধ করব আপনারা কুফরী গণতন্ত্র কে ইসলাম সম্মত প্রমান করার জন্য অকারনে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করছেন সেটুকু ব্যয় করে যদি আবুবকর (রাঃ) এর ব্যবহৃত যন্ত্রটি উদ্ধার করতে পারতেন তবে গনতান্ত্রিকরা আপনাদের চিরকাল স্বপ্ন রাখতো। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রতি ৫ বছর পর পর নির্বাচন দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না কেবল বোতাম টিপলেই ভোটের ফলাফল বের হয়ে আসতো। আমি এদের প্রশ্ন করি যদি বর্তমানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট শ তিনেক লোকের সাথে পরামর্শ করে কোন একজন ব্যক্তিকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনয়ন দেয় তবে এটা গণতন্ত্র সম্মত হবে কি না? তা

(63) বুখারী কিতাবুল আহকাম বাবুল ইস্তিখলাফ।

যদি না হয় তবে আবুবকর (রাঃ) দুজন (64) লোকের সাথে পরামর্শ করে একজন লোককে মনোনয়ন দিলেন তার এ কাজটি গণতন্ত্র সম্মত হয় কিভাবে? খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের মত সাহাবী কেবল মাত্র পত্রযোগে জানতে পারলেন কে খলীফা হয়েছে এবং সাথে সাথেই নতুন খলীফার আনুগত্য করা নিজের উপর বাধ্যতামূলক মনে করলেন। আপনারা জানেন কি ইসলামী বিধান মতে খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের একথা বলার কোন অধিকার ছিল না যে, আমাকে না জানিয়েই কেন উমরকে খলীফা করা হল? আমার মতমতকে কেন উপেক্ষা করা হল? আপনাদের গণতন্ত্র কি এধরনের শিক্ষাই দেয়?

আরও একটা বিষয় জেনে রাখুন যখন আবু বকর (রাঃ) উসমান (রাঃ) কে দিয়ে উমর (রাঃ) এর খেলাফতের মনোনয়ন পত্র লেখাচ্ছিলেন তখন

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي فحافة إلى المسلمين أما بعد

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এটা আবু কুহাফার পুত্র আবু বকরের পক্ষ হতে সাধারণে মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ

এতদুর বলতেই অসুস্থতার কারনে আবু বকর (রাঃ) জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন উসমান (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) কি বলতে চেয়েছিলেন তা জানতেন এবং ভয় করছিলেন যদি এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে মুসলিমরা খলীফা কে হবে তা নিয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়ে যাবে তাই তিনি নিজ দায়িত্বে পত্রটি সম্পূর্ণ লিখে নেন এভাবে

فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم ألكم خيرا منه

আমি তোমাদের উপর উমর ইবনে খাত্তাবকে খলীফা করে যাচ্ছি আর এ বিষয়ে আমি উত্তম ব্যক্তি কে তা নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করতে ত্রুটি করিনি।

পরে আবু বকর (রাঃ) এর জ্ঞান ফিরলে তিনি যখন দেখলেন উসমান (রাঃ) নিজ দায়িত্বে পত্রটি পুরো লিখে নিয়েছেন তিনি খুশি হয়ে বললেন,

أراك خفت أن يختلف الناس إن اختلفت نفسي في غشيتي قال نعم

মনে হচ্ছে তুমি ভয় করছিলে যে, আমি যদি এখনই মারা যায় তবে মুসলিমরা খিলাফতের ব্যাপারে মতপার্থক্য করবে তাই নিজেই লিখে দিয়েছো?

উসমান (রাঃ) সম্মতি জানালে আবু বকর (রাঃ) বললেন,

جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع

(64) আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ এবং উসমান (রাঃ)

আল্লাহ তোমাকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ হতে প্রভূত কল্যান দান করুন এবং তিনি উক্ত স্থানে উসমান (رضي الله عنه) এর লিখে দেওয়া কথাটিই বহাল রাখলেন (65)

আজ দেড় হাজার বছর পর কেউ কেউ দাবি করছেন মুসলিমরা উমর (رضي الله عنه) এর খেলাফতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন বলেই আবু বকর (رضي الله عنه) তাকে নিয়োগ দিয়েছেন যদি সেদিন ভোট করাও হত তবু নাকি উমরই জয়ী হতেন অথচ যিনি নিয়োগ করছেন আর যিনি লিখছেন সেই দুজন বিচক্ষণ সাহাবী আসংকা করছেন একজনকে খলীফা নিয়োগ না করে গেলে পরবর্তীতে সাধারণ জনগন দলাদলি ও মতপার্থক্যে লিপ্ত হবে। সাধারণ জনগনের বেশিরভাগ অংশ উমর (رضي الله عنه) এর জন্য পাগলাপারা হয়ে গেছে এজন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি বরং কাউকে নিয়োগ না দিলে কে নেতা হবে তা নিয়ে জনগনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য হবে সে কারনেই একজনকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

উমর (رضي الله عنه) কে খেলাফতের ব্যাপারে স্থলা ভিষিক্ত করার পর আবু বকর (رضي الله عنه) বলেন,

إني وليت أمركم خيركم في نفسي

আমার কাছে যাকে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে তাকেই দায়িত্ব দিয়েছি। (66)

আবু বকর (رضي الله عنه) বলেননি যার পক্ষে জনসমর্থন বেশি আমি তাকে মনোনীত করার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি ইসলামে উত্তম বলা হয় বেশি তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিকে সংখ্যা ও শক্তিতে যে বেশি তাকে নই। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات/১৩]

তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সেই যে বেশি তাকওয়াবান। (হুজুরাত/১৩)

সুতরাং আবু বকর (رضي الله عنه) বলছেন আমি তোমাদের মধ্যে যে বেশি আল্লাহকে ভয় করে বলে মনে করেছে তাকে নিয়োগ দিয়েছি যার পক্ষে লোক বেশি তাকে নই। এই সুক্ষ বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকলে তর্কিকদের যুক্তি তর্ক হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

<# একজন খলীফা পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে যাওয়ার বিষয়টির যৌক্তিকতা #>

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন একজন খলীফা পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে যাবেন এটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? আসলে ইসলামের মেজাজের সাথে যারা পরিচিত নন তারাই এমনটি ভাবতে পারেন। তাকওয়া ও আমলের কারনে কিছু ব্যক্তি নির্ভরযোগ্যতার এমন সীমায় পৌছে যায় যে, খলীফা নির্বাচনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের উপর আস্তা রাখা হয়। আপনার বিবাহ সঠিক হয়েছে কিনা,

(65) তারিখে তবারী, ইমাম যাহাবীর তারিখে ইসলাম

(66) তারিখে তবারী, ইমাম যাহাবীর তারিখে ইসলাম, উসুদুল গাবা

আপনার স্ত্রী তালাক হয়েছে কিনা এসব ফতওয়া কি নির্ভরযোগ্য আলেমদের নিকট হতেই নেওয়া হয় না? রসুলুল্লাহ (ﷺ) যে, হাতের ইশারাতে চাদ দুভাগ করে ফেলেছিলেন এত বড় আশ্চর্যের কথাটিও আমরা বিশ্বাস করি কারন নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক তা বর্ণিত হয়েছে। আপনি বনী ইসরাঈলের সেই ব্যাবসায়ীর কথাই চিন্তা করুন কোন সাক্ষী প্রমান ছাড়া শুধু মাত্র তাকওয়ার উপর নির্ভর করে একজন মুসলিমকে যিনি অনেক টাকা ঋন দিয়েছিলেন, তা ফেরতও পেয়েছিলেন। যারা গনতন্ত্রের উদ্ভাবক তারা ইমান ও তাকওয়াতে বিশ্বাসী নই। তাদের ধর্ম নেই, কিতাব নেই তাই তারা কারও উপর ভরসা করতে পারেনা। জনগনকেও সন্দেহে নিপতিত করে। সরকারপক্ষ যে সিদ্ধান্তই নিক তার ভিতর দুর্নিতি ও স্বজনপ্রিতির গন্ধ তালাশ করে। গুরু হয় হরতাল, লাঠালাঠি, অশান্তি। ইসলাম একজনকে অন্যজনের উপর আস্তাশীল করে তোলে। একজন বিশিষ্ট নেতা নিজ দায়িত্বে একজন খলীফা নিয়োগ করবেন এটা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য মোটেও কঠিন নই। আমরা তো আল্লাহতে বিশ্বাসী তাওহীদেও, সৈনিক।

<# শুরা বা মাশওয়ারার সাথে ভোটাভোটের পার্থক্য #>

মাশওয়ারা বা পরমর্শের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত করার যে পদ্ধতি ইসলামে রয়েছে সেটাকেই গণতন্ত্রপন্থিরা সব থেকে বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। মাশওয়ারাকে তারা ভোটাভোটের সমপর্যায়ের বলে মনে করে। ভোটাভোটের সাথে মাশওয়ারার বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে

- মাশওয়ারা অর্থ পরামর্শ করা। যেমন আপনার রোগ হলে আপনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেন আপনি আরবীতে বলবেন (استشأب بيطلا) আমি ডাক্তারের সাথে মাশওয়ারা করেছি। একই ভাবে আপনি কোন কাজে একজন কর্মচারী নিয়োগ দেবেন তখন আপনি কি করেন? উক্ত কর্মচারীকে চেনে এমন কারও সাথে পরামর্শ করেন তার সভাব চরিত্র ও বিশ্বস্ততা নিয়ে। আরবীতে বলা হয় (شرت العسل و اشترته) আমি মৌমাছির চাক হতে মধু বের করে এনেছি। এখানে (و—ش) শব্দ ব্যবহার করা হয় যা হতে মাশওয়ারা উদ্ভূত। অর্থাৎ অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সঠিক ও সময়োপযুগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টাই হল মাশওয়ারা। অন্য কথায় যেভাবে চাক হতে মধু বের করা হয় সেভাবে সত্য ও সঠিক বিষয়টি খুঁজে পাওয়ার জন্য অভিজ্ঞজনের নিকট পরামর্শ করাটাই মাশওয়ারা।

এর সাথে ভোটাভোটের কি পার্থক্য তা কৃষক ও শহুরে লোকটির উদাহরন থেকেই বোঝা যাবে। সেখানে গ্রাম্য মাতব্বরটি ভোটাভোটের পক্ষে মত না দিয়ে যদি বলতেন দলীল সম্পর্কে জানে এমন কারও নিকট পরামর্শ করে দেখো জমিটির বৈধ মালিক কে তবে নিশ্চয় প্রস্তাবটি উদ্ভূত হত না। একই ভাবে দৈনন্দিন জীবনে আপনি যেসব সমস্যায় পড়েন প্রায় প্রতিদিনই সেসব বিষয়ে কারও না কারও সাথে পরামর্শ করেন। একবার চিন্তা করে দেখুন তো রোগ হলে ঔষধ নির্ণয়ে বা নিজ দোকানে কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার সময় পরমর্শের পরিবর্তে ভোটাভোট করলে ব্যাপারটি কেমন হয়? আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে, মাশওয়ারা বা পরামর্শ হল যে বিষয়ে যে জানে তার সাথে আলোচনা করে সত্য ও সঠিক সামাধান বের করার চেষ্টা করা আর ভোটাভোট হল সত্যকে পরিত্যাগ করে অধিকাংশের খেয়াল খুশি মত চলা।

প্রথমটি যৌক্তিক আর দ্বিতীয়টি পাগলামীর সমতুল্য। প্রথমটিই ইসলামী পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি গনতান্ত্রিক পদ্ধতি।

এখন দেখুন মশওয়ারার মাধ্যমে কিভাবে ইসলামের খলীফা নিয়োগ দেওয়া হয়। কখনও কখনও শুনে থাকবেন কোন বড় মাপের ব্যক্তি বড় প্রকৃতির রোগ হলে বড় ডাক্তারদের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উক্ত ব্যক্তির চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এখানে কি করা হয় একটু চিন্তা করুন,

এসকল অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে ভোটাভোট করে বেশিরভাগ চিকিৎসক যে ধরনের পদ্ধতির পক্ষে রায় দেয় সেটা গ্রহণযোগ্য হয় কি?

আমার মনে হয় আপনি জানেন যে, এমনটি করা হয় না। এটা কোন কার্যকরী পন্থাও নই। বরং চিকিৎসকদের উক্ত কমিটির একজন সভাপতি থাকেন সকলের নিকট পরামর্শ গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত তিনিই নেন।

<# ইসলামে মশওয়ারার মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি #>

ইসলামে মশওয়ারার মাধ্যমে খলীফা নির্ণয়ের পদ্ধতিটা এধরনের বাস্তব সম্মত। আমরা সহজে বলতে পারি মশওয়ারার মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন দুভাবে হতে পারে।

১. যখন মজলিসে শুরার একজন সভাপতি বা সিদ্ধান্তদাতা রয়েছেন। যেমন ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। হযরত উমর (রাঃ) যে ছয়জনকে ঠিক করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন যে কাহিনী বুখারীতে এভাবে বর্ণিত আছে।

فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرحمن أيكما تيرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرون أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلى الله علي أن لا آلو عن أفضلكم ؟ قالوا نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالأخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه

উক্ত ছয় জনের উদ্দেশ্যে আব্দুর রাহমান ইবন আওফ (রাঃ) বললেন তোমরা নিজেদের অধিকার তুলে নিয়ে তিন জনকে অধিকার দাও যুবাইর (রাঃ) বললেন আমি আমার অধিকার আলীকে দিলাম তালহাহ (রাঃ) বললেন আমার অধিকার উসমানকে দিলাম সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন আমার অধিকার আব্দুর রাহমান ইবন আওফকে দিলাম। আব্দুর রাহমান ইবন আওফ (রাঃ) হযরত আলী ও উসমানকে বললেন আপনাদের মধ্যে যে কেউই খিলাফতের দাবী হতে সরে আসবে আমরা তাকেই

সিদ্ধান্তদাতা মেনে নেব (সে যার হাতে বায়াত হবে তাকে খলীফা বলে মেনে নেব) আল্লাহ ও ইসলামের স্বার্থে সে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই নিয়োগ দেবে। তারা দুজন চুপ থাকেন তখন আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ (رضي الله عنه) বলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে যদি আমি খিলাফতের দাবি হতে সরে আসি তবে আপনারা আমাকে সিদ্ধান্তদাতা মেনে নিতে রাজী আছেন কিনা? আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে তা নির্ণয় করতে আমি একটুও ত্রুটি করব না। আলী (رضي الله عنه) ও উসমান (رضي الله عنه) বললেন হ্যাঁ আমরা রাজী আছি। (এভাবে আব্দুর রাহমান ইবনের আওফ প্রচলিত অর্থে শুরা কমিটির সভাপতি হয়ে গেলেন এবং খলীফা কে হবে তার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি তার অধিকারে চলে আসল পুরো মুসলিম উম্মাহ এখন তার সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য) তখন তিনি আলী (رضي الله عنه) কে বললেন আপনি আল্লাহর রসুলের আত্মীয় এবং ইসলামে অগ্রবর্তী যদি আমি আপনাকে নিয়োগ করি তবে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন আর যদি উসমানকে নিয়োগ করি তবে তার আনুগত্য করবেন। তারপর তিনি উসমান (رضي الله عنه) কে নির্জনে ডেকে একই কথা বললেন পরে বললেন উসমান তোমার হাতটি বাড়িয়ে দাও এবং তার হাতে বায়াত হলেন আলী (رضي الله عنه) ও বায়াত হলেন তারপর সমস্ত মানুষ বায়াত হল।⁽⁶⁷⁾

ইসলামী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা এই ঘটনারও গণতন্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা বলে আব্দুর রাহমান ইবন আওফ মদীনার ওলীতে গলীতে ঘুরে ঘুরে জনমত যাচায় করেছেন যখন তিনি বুঝতে পারলেন উসমানের পক্ষে জনমত ভারি তখন তিনি তার হাতে বায়াত হন। ওলীতে গলীতে ঘুরাঘুরি করার ঘটনা সত্য বটে কিন্তু এভাবে বেশিরভাগ লোক কার পক্ষে তা নিশ্চিতভাবে জানা যাওয়ার দাবি করা পূর্বের মতই উদ্ভট আরও মনে রাখতে হবে বায়াত হওয়ার আগমুহর্তেও তিনি বললেন হে আলী যদি আমি আপনাকে নেতৃত্ব দিই তবে ইনসাফ করবেন আর যদি উসমানকে দিই তবে তার আনুগত্য করবেন অর্থাৎ ওলীতে গলীতে ঘুরে ঘুরে জনমত যাচায়ের পর যখন তার মনে হল উসমানের (رضي الله عنه) পক্ষে জনমত ভারি তখনও তার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল আলী (رضي الله عنه) এর হাতে বায়াত হওয়ার। ইসলাম অনুযায়ী বেশির ভাগ লোক যার পক্ষে তার হাতেই বায়াত হতে হবে এটা শর্ত নই বরং শর্ত হল কোরআন হাদীসের মানদণ্ডে যোগ্য ব্যক্তির নিকট বায়াত হতে হবে। আব্দুর রাহমান ইবন আওফ যে বললেন ,

لا آلو عن أفضلكم

আমি আপনাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেব⁽⁶⁸⁾

আপনারা কি মনে করেন বেশির ভাগ লোক যার পক্ষে থাকবে সেই শ্রেষ্ঠ? নাকি শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হবে তাকওয়া ও জ্ঞানের মানদণ্ডে?

<# জনমতের গুরুত্বের ব্যাপারে গণতন্ত্র ও ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য। #>

⁽⁶⁷⁾ বুখারী কিতাবুল ফাদাইল বাবু কিস্সাতিল বায়আতি ওয়াল ইতিফাক আলা উসমান ইবন আফ্ফান (رضي الله عنه)

⁽⁶⁸⁾ উপরে উল্লেখিত হাদীসের অংশ

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে ইসলামে খলীফা নির্বাচনে জনমতের একটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে।

আলমাওরুদী বলেন,

فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطَهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعِ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ

যখন আহলুল হিল ওয়াল আকদ খলীফা নির্ণয়ের জন্য আলোচনা শুরু করবেন তখন খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে গবেষণা করবেন খলীফা হওয়ার শর্তসমূহ কার মধ্যে বেশি পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কে বেশি শ্রেষ্ঠ আর কার নেতৃত্ব মানুষ পছন্দ করে ফলে তার হাতে বায়াত হতে তারা অস্বীকৃতি জানাবে না।^(৬৭)

কিন্তু জনমতের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে গণতন্ত্রের আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে প্রথমত গণতন্ত্র জনসমর্থনকেই প্রধান ও একমাত্র যোগ্যতা বলে মনে করে আর ইসলামে নেতৃত্বের যোগ্যতা জনসমর্থনের উপর নির্ভরশীল নয় বরং কোরআন হাদীসের মানদণ্ডে এ যোগ্যতা বিচার করা হয়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات/১৩]

তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত সেই যে বেশি তাকওয়াবান। (হজুরাত/১৩)

যখন তালুতকে নেতৃত্ব দেওয়া হল তখন তার সম্প্রদায় বলল,

أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ [البقرة/২৪৭]

কিভাবে সে আমাদের উপর নেতৃত্ব পেতে পারে অথচ আমরাই তার তুলনায় নেতৃত্বের বেশি যোগ্য তাকে তো সম্পদ দেওয়া হয়নি (বাকারা ২৪৭)

সেই সম্প্রদায়ের নবী (ﷺ) বললেন,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة/২৪৭]

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছেন এবং তাকে অধিক জ্ঞান ও শক্তি প্রদান করেছেন আর আল্লাহ যাকে খুশি নেতৃত্ব প্রদান করেন আল্লাহ উদার ও সর্ব জ্ঞানী (বাকারাহ ২৪৭)

বুখারীতে বর্ণিত আছে,

(৬৭) আলআহকাম আসসুলতানিয়াহ

أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أسامه على قوم فطعنوا في إمارته فقال (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وإيم الله لقد كان خليفاً للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده

রসুলুল্লাহ (ﷺ) উসামা ইবনে যায়েদকে কোন এক সম্প্রদায়ের উপর নেতৃত্ব দিলে তারা তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল (কারণ তিনি দাসের ছেলে ছিলেন) রসুলুল্লাহ বললেন তোমরা এখন তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছ পূর্বে এর বাবার নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছ অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল আর এ তার বাবার পর আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় (70)

অতএব জনগনের অপছন্দ সত্ত্বেও তালুত ও উসামার বাবা যায়েদের নেতৃত্বের যোগ্যতার ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রসুল (ﷺ) সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

কোরআন হাদীসের মানদণ্ডে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কাকে জনগন বেশি পছন্দ করে সেটা লক্ষ রাখা উচিত যাতে মতপার্থক্যের সৃষ্টি না হয়। কিন্তু যদি জনগন ফাসেক ফাজের ছাড়া কোন নেতার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট না হয় তবে তাদের সে আবদার মানা যাবে না। কিন্তু গণতন্ত্র বলে যে কোন অবস্থায় বেশিরভাগ জনগন যার পক্ষে তাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে যদিও সে মাতাল হয়।

জনসমর্থনের ব্যাপারে গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের দ্বিতীয় পার্থক্যটি হল। গণতন্ত্র সরাসরি জনগনের হাতে নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা তুলে দেয়। ফলে অযোগ্য ও অপদার্থ নেতারা ক্ষমতায় চলে আসে। কোরআন হাদীসের মানদণ্ডে নেতা নির্বাচন করার যোগ্যতা কয়জন জনগনের আছে? বেশিরভাগ জনগন তো ওয়ুর মাসআলা পর্যন্ত আবগত নই। কিন্তু ইসলামে এ সুযোগ দেওয়া হয় না। খলীফা নির্বাচনের ভার ও অধিকার পরিপূর্ণ ভাবেই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের হাতে থাকে। যাদের বলা হয় আহলুশ শুরা (أهل الشورى)

বা (وإشرا) “পরামর্শের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ”। এই সকল ব্যক্তিবর্গ যখন কোনো একজনকে কর্তৃত্ব প্রদান করে তখন খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে তার হাতে চলে যায় যাকে প্রচলিত পরিভাষায় শুরা সদস্যদের সভাপতি বলা যায় যেমনটি আমরা আব্দুর রাহমান ইবনে আওফের ক্ষেত্রে দেখেছি। তিনি প্রথমেই দেখবেন কে বেশি তাকওয়াবান ও ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী। যদি দেখা যায় তাকওয়া ও জ্ঞানে একাধিক ব্যক্তি প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছেন তখন বিবেচনা করবেন কার নেতৃত্ব জনগন বেশি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নই যে, তিনি জনগনের মধ্যে নির্বাচন শুরু করে দেবেন কারণ এতে মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হবে বরং তিনি স্থায়ী বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিষয়টি অনুভব করার চেষ্টা করবেন যেমনটি আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ করেছেন। এর সাথে গণতন্ত্রের কোন মিল খুঁজে পান কি? যদি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কার পক্ষে জনসমর্থন বেশি তা ঘুরে ঘুরে দেখে রায় ঘোষনার জন্য তবে তা কতটুকু গণতন্ত্র সম্মত হবে?

(70) বুখারী কিতাবুল মাগাজী বাবু গজওয়ায় যায়দ ইবনে হারিসা

ইসলাম জনসমর্থনকে বিবেচনা করে আর গণতন্ত্র জনসমর্থনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনে করে। কোন কিছুকে সিদ্ধান্তকারী মনে করা আর বিবেচনায় রাখার মধ্যে কি পার্থক্য তা বুঝতে আশা করি অধিক বুৎপত্তির প্রয়োজন হবে না।

<# পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করার দ্বিতীয় পদ্ধতি #>

২. পরামর্শের মাধ্যমে দ্বিতীয় আর একটি পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচিত হতে পারে। এটা তখন যখন মজলিসে শুরার কোন সভাপতি থাকবে না। তখন কিভাবে খলীফা নির্বাচিত হবে সে বিষয়টি বুঝতে হলে আবু বকর (রাঃ) কে কিভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল তা দেখতে হবে।

বুখারী শরীফের একটি লম্বা হাদীসে বর্ণিত আছে হযরত উমর (রাঃ) কে বলা হল কেউ কেউ বলছে উমর মারা যাওয়ার সাথে সাথেই আমি অমুকের হাতে বায়াত হব আবুবকরের বায়াতও তো হঠাৎই হয়েছিল। উমর (রাঃ) একথা শুনে ভীষন রেগে গেলেন তার ইচ্ছা ছিল তখনই উঠে বক্তব্য দিয়ে মানুষকে এধরনের কাজ হতে সতর্ক করা কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাকে নিষেধ করলে তিনি মদিনাতে ফিরে এবিষয়ে বক্তব্য দিলেন বক্তব্যের ভিতর তিনি বললেন,

فلا يغترون أمرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتنة وثمت ألا وإها قد كانت كذلك ولكن الله وفقى شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا

আবু বকরের বায়াত যে, হঠাৎ হয়েছিল এটা মনে করে কেউ যেন প্রতারণিত না হয় হ্যা সেটা অরকমই হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তার ক্ষতি হতে রক্ষা করেছেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাকে মানুষ আবুবকরের মত মান্য করে? যে কেউ পরামর্শ ছাড়া কারও হাতে বায়াত হয় তাকে এবং সে যার হাতে বায়াত হচ্ছে উভয়কে হত্যা করা হবে। (বুখারী)

এর পর তিনি এভাবে হঠাৎ বায়াত হওয়ার কারন বর্ণনা করে বলেন ,

وإنه قد كان من خبرنا حين توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار

ব্যাপারটি এই ছিল যে, আল্লাহর রসুল (সাঃ) এর ওফাতের পর আনসাররা আমাদের বিরোধিতা করল তারা সকলে সাকিফায়ে বনি সাইদাতে (আনসারদের সম্মিলনস্থল) একত্রিত হল আর আলী যুবাইর ও তাদের যারা অনুসরণ করেছিল তারও আমাদের বিরুদ্ধে গেল অন্যান্য মুহাজিররা আবু বকর (রাঃ) এর ব্যাপারে একমত হল। সেই অবস্থায় আমি আবুবকরকে বললাম চলুন আমরা আমাদের আনসার ভাইদের নিকট যায়।

সেখানে যাওয়ার পর কি কি ঘটনা ঘটেছিল উমর (রাঃ) তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন এক পর্যায়ে আনসাররা প্রস্তাব করল।

منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش

তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর আর আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর
হযরত উমর (রাঃ) বলেন,

فكثر اللغظ وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه
المهاجرون ثم بايعته الأنصار

তারপর যখন অতিরিক্ত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল এবং আমি মতপার্থক্য হওয়ার আসংক্ষা করলাম তখন
বললাম আবু বকর আপনার হস্ত প্রসারিত করুন তিনি তার হস্ত প্রসারিত করলে আমি তার হাতে বায়াত
হলাম তারপর মুহাজীর ও আনসাররা বায়াত হল।⁽⁷¹⁾

যারা নিতান্ত গর্বভরে প্রচার করেন আবু বকর (রাঃ) কে পরিপূর্ণ গনতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত করা হয়েছে
তারা এই হাদীসের প্রতি একটু মনযোগ দেবেন কি? আবু বকরের বায়াত সম্পর্কে হযরত উমরই কি ভাল
জানবেন নাকি আপনারা? তিনিই তো বলছেন তার বায়াত হঠাৎই হয়েছিল তার বর্ণনাও তার নিজ মুখ
থেকেই শুনলেন। একদিকে আলী যুবাইর (রাঃ) ও তাদের অনুসারীরা অন্য দিকে সমস্ত আনসাররা (রাঃ)
আবু বকর (রাঃ) এর বিপক্ষে ছিলেন এমনকি উমর (রাঃ) বলেন,

فكثر اللغظ وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه
المهاجرون ثم بايعته الأنصار

তারপর যখন অতিরিক্ত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল এবং আমি মতপার্থক্য হওয়ার আসংক্ষা করলাম তখন
বললাম আবু বকর আপনার হস্ত প্রসারিত করুন তিনি তার হস্ত প্রসারিত করলে আমি তার হাতে বায়াত
হলাম তারপর মুহাজীর ও আনসাররা বায়াত হল।⁽⁷²⁾

এনারা বলেন, পুরো উম্মতের বেশির ভাগের রায় নাকি আবু বকরের পক্ষে ছিল আর যদি ভোট হত তবে
তিনিই জয়ী হতেন অথচ উমর (রাঃ) নিজে বলছেন,

حتى فرقت من الاختلاف

অবস্থা এমন হল যে, আমি মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি হয়ে যাওয়ার ভয় করলাম

(71) বুখারী কিতাবুল মুহারিবিন মিন আহলিল কুফরি ওয়র রিদা বাবু রজমিল হুবলা

(72) বুখারী কিতাবুল মুহারিবিন মিন আহলিল কুফরি ওয়র রিদা বাবু রজমিল হুবলা

এই সঙ্গিন অবস্থা হতে মুসলিম উম্মাকে বচানোরা গুরু দায়িত্ব উমর (রাঃ) নিজে কাধে তুলে নেন আলী (রাঃ) যুবাইর (রাঃ) আনসার সাহাবারা (রাঃ) বা অন্য যে কেউই আবু বকর (রাঃ) এর ব্যাপারে নাখোশ ছিলেন অথবা যারা তার পক্ষেই ছিলেন কিন্তু উক্ত সমাবেশে হাজির ছিলেন না তাদের কারও সাথে পরামর্শ না করে এবং তাদের হাজির হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে হঠাৎই আবুবকরের হাতে বায়াত হয়ে যান। আর এভাবেই সকল মতপার্থক্যের অবসান হয়। এমনকি আলী (রাঃ) এর মত সাহাবী পরে বলেছিলেন,

ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرايتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا

আপনারা একাই খেলাফতের বিষয়টি সামাধা করে ফেললেন অথচ আমরা মনে করতাম রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আমাদের আত্মীয়তার কারণে নিশ্চয় আমাদের (অংশ গ্রহনের) কিছু হক ছিল।⁽⁷³⁾

ইবনে হাযার আল আসকালানী আল মাজিরী থেকে বলেন,

أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولاً والعذر لأبي بكر أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كما تقدم في حديث السقيفة فلم ينتظروه

আলী (রাঃ) এর উদ্দেশ্য হল আবুবকরের হাতে বায়াত হওয়ার সময় তার পরামর্শ নেওয়া হয়নি আর আবু বকর (রাঃ) ওয়র এই যে তিনি ভয় করছিলেন যদি বায়াত সম্পাদিত হতে দেরি হয়ে যায় তবে মতপার্থক্য হবে যেমনটি আনসারদের পক্ষ হতে হয়েছিল য সাকিফার হাদিসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ফলে তারা আলী (রাঃ) এর জন্য অপেক্ষা করেননি।⁽⁷⁴⁾

যে বায়াতে আলী (রাঃ) এর মত সাহাবা অনুপস্থিত ছিলেন সেটাকে গণতন্ত্র সম্মত বায়াত কিভাবে বলা যায়? আবু বকর (রাঃ) এর বায়াত সম্পর্কে আপনারাই কি ভাল জানবেন নাকি উমর (রাঃ) বলছেন ,

أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإها قد كانت كذلك

সে বলে আবুবকরের বায়াত তো হঠাৎ হয়েছে পরে তা সফল হয়েছে হ্যা ওরকমই ছিল

যিনি বায়াত করেছেন তিনি বলছেন ওটা হঠাৎই হয়েছিল। পরবর্তীতে ওয়র ছাড়া এমন বায়াত হওয়া থেকে তিনি নিষেধও করলেন যে ব্যক্তি বলেছিল আবুবকরের হাতে উমর যেমন বায়াত হয়েছিল আমিও সেভাবে অমুকের হাতে বায়াত হব তার উপর তিনি ভীষন রেগে গিয়েছিলেন কারণ যে পরিস্থিতিতে তিনি

⁽⁷³⁾ বুখারী কিতাবুল মাগাযী বাবু গযওয়াতি খয়বার হাদীসে (ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرايتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا)

অংশটুতে খিলাফতের ব্যাপারে আলী (রাঃ) এর পরামর্শ না নেওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে অথচ তিনি মদীনাতেই বিদ্যমান ছিলেন।

⁽⁷⁴⁾ ফাতহুল বারী খন্ড ৭ পৃষ্ঠা ৪৯৫

এধরনের বায়াত হয়েছেন তা এখন বিদ্যমান নেই। যদি আবু বকরের বায়াত গণতন্ত্র সম্মতই হয়ে থাকে তবে উমর কি গণতন্ত্র সম্মত বায়াত হতেই আমাদের নিষেধ করেছেন?

<# ইসলামে জনসমর্থন নয় বরং বায়াতের ভূমিকাই প্রধান #>

আসলে ইসলামে খলীফা নির্বাচনে জনসমর্থন নই বরং বায়াতের ভূমিকাই প্রধান। একদল আস্থা ভাজন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির হাতে বায়াত গ্রহন করেন তবে প্রথম বায়াতের পর আর কেউ খেলাফতের দাবি করতে পারবে না। যার মত নেওয়া হয়নি বা যিনি উপস্থিত ছিলেন না তিনি বায়াত কৃত খলীফার আনুগত্য হতে দূরে থাকতে পারবেন না। যদি একই সাথে দুজন ব্যক্তি খেলাফতের দাবি করেন তবে কে খলীফা হবে এ বিষয়ে আপনারা কেমন রায় দেবেন? নিশ্চয় বলবেন দেখতে হবে কার পক্ষে জনসমর্থন বেশি। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কি রায় দিয়েছে লক্ষ করুন।

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون (. قالوا فما تأمرونا ؟ قال (فوا بيعة الأول فالأول

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন বানী ইসরাঈলকে নবীরা শাসন করত যখনই কোন নবী মৃত্যুবরণ করতেন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন আর আমার পর কোন নবী নেই কিন্তু খলীফা হবে একই সময়ে একাধিক খলীফাও হবে। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন তখন আমাদের কি করতে আদেশ করেন?

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ,

প্রথম যার বায়াত সম্পন্ন হয়েছে তার বায়াত পুরা করো।⁽⁷⁵⁾

আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেননি ভোটভোটের মাধ্যমে বা অন্তত ওলীতে গলীতে ঘুরে ঘুরে বোঝার চেষ্টা করো কার পক্ষে জনমত ভারি। বরং তিনি বললেন যার হাতে প্রথম বায়াত সম্পন্ন হয়েছে সেই বৈধ খলীফা। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এই রায়ের পর আপনারা গণতন্ত্র হতে তওবা করবেন কি?

কোন কাজ প্রথমে শুরু করে দেওয়ার মাধ্যমে মতপার্থক্য নিরসনের ব্যাপারটি বাস্তব সম্মত। মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা শেখানো হয়। সমস্ত মুসলিমরা এক নেতার নেতৃত্বে এক দল হয়ে থাকবে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে এ জাতি নেতাকাল্প হয়ে যায় তবে দ্রুত নতুন একটি নেতার প্রয়োজনীয়তা এতটাই তীব্র যে, এমনকি রসুলুল্লাহর (ﷺ) ওফাতের পর তার দাফনকার্য পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল খেলাফত সংক্রান্ত সমস্যা সামাধান করার জন্য। এমতাবস্থায় যদি মুসলিমদের গ্রহনযোগ্য ও আস্থাশীল ব্যক্তিদের একটি অংশ সংখ্যায় তারা কম হন আর বেশি হন এমনকি ক্ষেত্র

⁽⁷⁵⁾ বুখারী কিতাবুল আম্মিয়া বাবু মা যুকিরা আন বানী ইসরাঈল, মুসলিম কিতাবুল ইমারা বাবুল ওফা বিবায়আতিল খুলাফা আল আওয়াল ফাল আওয়াল

বিশেষে যদি একজনও হন অন্য একজন আস্থাশীল ব্যক্তির হাতে বায়াত হয় তবে অন্য মুসলিমদের উপরও বায়াত করা ওয়াজীব হয়ে যায়। কারন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর স্পষ্ট নির্দেশ যে, প্রথম বায়াতকে পুরা করতে হবে। তবে প্রথম বায়াতকারী অবশ্যই লক্ষ রাখবেন যে, তিনি নিজে কতটুকু প্রভাবের অধিকারী এবং যার হাতে বায়াত হচ্ছেন সে কতটুকু গ্রহণযোগ্য। তবে সর্বশ্রমে হল তড়িঘড়ি না করে সর্বোচ্চ সংখ্যক আলেম ওলামার উপস্থিতিতে মাশওয়ারার মাধ্যমে একজনের হাতে বায়াত হওয়া। এটাই বেশি নিরাপদ। হযরত উমারের সতর্কতারও এটাই উদ্দেশ্য। তবে যে কারনে উমর (রাঃ) নিজ উদ্যোগে মাশওয়ারা ছাড়াই আবুবকর (রাঃ) এর হাতে বায়াত হয়েছিলেন তেমন মতপার্থক্য ও তর্কবিতর্ক দেখা দিলে এ ধরনের একক বায়াত বৈধ হবে। নির্ভরযোগ্য আলেম ওলামারা পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করবেন এর অর্থও এই নই যে, তাদের মধ্যে ভোটভোটি হবে বরং তারা আলোচনা করে ও পরস্পরকে ছাড় দিয়ে একজন ব্যক্তির হাতে বায়াত হওয়ার ব্যাপারে একমত হবেন। সে ক্ষেত্রেও একজন ব্যক্তি থাকবে যিনি প্রথম বায়াত করবেন এই প্রথম বায়াতকারী দূরকম হতে পারে

১ . উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে প্রভাবশালী একজন বলবেন আপনারা খিলাফতের ব্যাপারে আমার রায় মানতে প্রস্তুত আছেন কি না। যদি সবাই মেনে নেই তবে তিনি যাকে পছন্দ করবেন সেই মুসলিম বিশ্বের খলীফা বলে গণ্য হবে। যেমনটি আব্দুররাহমান ইবনে আওফ (রাঃ) করেছিলেন।

২ . মজলিসের অন্য কেউ কোন একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে পারেন যে, অমুককে খিলাফতের ব্যাপারে অধিকার দিলে কেমন হয়।

পূর্ববর্তী খলীফাও মৃত্যুর আগে বলে যেতে পারেন অমুক যার হাতে বায়াত হয় তোমরা তাকে মেনে নিও। কারন খলীফা নিয়োগ করে যাওয়ার ক্ষমতা যার আছে এধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারও তার আছে।

যেভাবেই হোক যদি কোন আস্থাশীল ব্যক্তির হাতে কয়েকজন বা একজন আস্থাশীল ব্যক্তি বায়াত হয়ে যান তবে সেখানে অনুপস্থিতরা বলতে পারবেন না আমার মত নেওয়া হয় নি কেন? যেমনটি খালিদ (রাঃ) বলতে পারেন নি আলী (রাঃ) বলতে পারেন নি। কারন কে খলীফা হয়েছেন সেটিই ধার্তব্যের বিষয় তিনি যদি ইসলামী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হন তবে অন্য কোন অযুহাত দেখিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করা ইসলামে জায়েজ নই।

এই হল ইসলামের শুরা ব্যবস্থা। ভোটভোটির সাথে একে মিলানোর জন্য যতই ছুটাছুটি করা হোক তা অমূলক হবে।

<# খলীফা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইসলামের আরো কিছু অগণতান্ত্রিক নীতি। #>

খলীফার ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইসলামে আরও কিছু নীতি আছে যা অগণতান্ত্রিক

<# খলীফা কুরাইশী হতে হবে #>

১. খলীফা কুরাইশী হতে হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

খিলাফতের ব্যাপারটি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে দুজন ব্যক্তিও বিদ্যমান থাকে।
(বুখারী, মুসলিম)

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নেতৃত্ব কুরাইশদের বিচারক আনসারদের আযান হাবশীদের আর আমানত ইয়ামেনীদের। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, আল আলবানী সহীহ বলেছেন)

قدموا قريشا ولا تقدموها

আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন তোমরা কুরাইশদের অগ্রাধিকার দাও তাদের পিছনে ফেলো না⁽⁷⁶⁾
বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসদুটি উল্লেখ করার পর ইমাম আন্বাবী বলেন,

هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذاك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج باجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة

এই সকল হাদীস দলীল যে খেলাফতের ব্যাপারটি কুরাইশদের মধ্যেই সিমাবদ্ধ কুরাইশ ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা হিসাবে বায়াত করা বৈধ নই। এর উপর সাহাবাদের যুগে এবং তাদের পর তাবিইদের যুগে ইজমা সম্পাদিত হয়ে গেছে। যদি কোন বিদআতী এ বিষয়ে মতপার্থক্য করে তবে সাহাবা ও তাবেইনদের ইজমা ও সহীহ হাদীসের কারনে তার মত অগ্রহনযোগ্য হবে।⁽⁷⁷⁾

ইবনে হাযার কাজী ইয়াদ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন,

اشتراط كون الامام قرشيا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار

খলীফা যে কুরাইশী হতে হবে এটা সকল আলেমদের মত। আলেমরা এটাকে ইজমার মধ্যে গননা

(76) আল জামি, মুসনাদে শাফিই, মুসনাদে বাযযার, ফাতহুল বারী বাযহাকী শুআবুল ইমান

(77) শারহে মুসলিম

করেছেন সালাফ বা তাদের পরবর্তী কারও হতে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য বর্ণিত নেই।⁽⁷⁸⁾

আলমাওরুদী বলেন,

وَالسَّابِغُ : النَّسَبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ رُودِ النَّصِّ فِيهِ وَأَنْعِقَادِ الْجَمَاعِ عَلَيْهِ

খলীফা হওয়ার জন্য সপ্তম শর্ত হল কুরাইশ বংশের হওয়া কেননা এ বিষয়ে হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে আর এর উপর ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।⁽⁷⁹⁾

ইবনে খলদুন তার মুকাদ্দামায় বলেন,

وأما النسب القرشي فالإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك، واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادَةَ وقالوا: "منا أمير ومنكم أمير" بقوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"

খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে কুরাইশী বংশকে শর্ত করার ব্যাপারটি একারণে যে, সাহাবারা সাকীফাতে আবুবকর (রাঃ) এর হাতে বায়াত হওয়ার সময় এর উপর ইজমা করেছেন এবং যে সকল আনসার সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) এর হাতে বায়াত হতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর আর আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর তাদের কথার বিরুদ্ধে এই হাদীস ব্যবহার করা হয়েছিল যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন (الأئمة من قريش) নেতা হবে কুরাইশ বংশ হতে।

এর পরও যারা খলীফা কুরাইশ হওয়ার ব্যাপারটিতে এলার্জি প্রকাশ করেন তাদের বলব আপনাদের কাছে কি দলীল আছে যার ভিত্তিতে আপনারা এটা অস্বীকার করছেন? শুধু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেলেই বা মন মানতে না চাইলেই কোন কিছু অস্বীকার করতে হবে এ নীতি নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নই?

<# মেয়েদের খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না #>

২. মেয়েদের খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে যখন বলা হল পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে রাজত্ব দিয়েছে তিনি বললেন,

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

সেই সম্প্রদায় কখনই সফল হবে না যারা তাদের কর্তৃত্ব একজন মেয়ের হাতে তুলে দেয়⁽⁸⁰⁾

ইবন কাসির বলেন,

(78) ফাতহুল বারী

(79) আল আহকাম আসসুলতানিয়া

(80) বুখারী কিতাবুল মাগাজী বাবু কিতাবিন নাবিয়্যি (সাঃ) ইলা কিসরা ওয়া কায়সার

ويجب أن يكون ذكرًا

খলীফাকে অবশ্যয় পুরুষ হতে হবে (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আলকুরতুবী বলেন,

وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, কোন মহিলা খলীফা হতে পারবে না। (তাফসীরে কুরতুবী)

<# জোর পূর্বক ক্ষমতা দখলকারী সঠিকভাবে দেশ শাসন করলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। #>

৩. যদিও জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল জায়েজ নই কিন্তু কেউ তা করলে তার আনুগত্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হবে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ হবে। যদি সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে দেশ পরিচালনা করে। এবিষয়ে ইসলামের নীতি হল ,

জন্ম হক যথা তথা কর্ম হক ভাল

فإن تغلب من له أهلية الامامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا، وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا من غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنتك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وباع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم.

যদি ইমাম হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করে তবে বলা হয় যে খলীফা হওয়ার এটি চতুর্থ পদ্ধতি সহল বিন আব্দুল্লাহ তাসাত্তারীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যদি কোন খলীফা জোর পূর্বক আমাদের উপর জেকে বসে তো আমরা কি করব? তিনি বললেন তোমরা তার আনুগত্য করবে সে যা চায় তা দেবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না তার আনুগত্য হতে পালিয়ে যাবে না যদি দিনের কোন গোপন বিষয়ে তোমাকে অবহিত করান তা ফাস করে দেবে না। ইবন খুওয়াইজ মিনদাদ বলেন যদি নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন কেউ কোনরূপ মাশওয়ারা ছাড়াই জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করে এবং মানুষ তার হাতে বায়াত হয় তবে তার কতৃত্ব নিশ্চিত হবে। (তাফসীরে কুরতুবী)

আননাব্বী বলেন ,

وأما من قهر الناس لشوكنه وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب اماما فان أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم

مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما

যে কেউ শক্তি বলে তার সহযোগীদের নিয়ে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে এবং খলীফা হিসাবে

আত্মপ্রকাশ করে তবে তার কর্তৃত্ব প্রযোজ্য হবে তার আনুগত্য ওয়াজিব হবে এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এমন কাজে তাকে অমান্য করা হারাম হবে সে দাস হক বা স্বাধীন অথবা ফাসিক হোক তবে শর্ত হল তাকে মুসলিম হতে হবে (শারহ মুসলিম)

ইবনে হাযার আল আসকালানী বলেন,

واما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فان طاعته تجب اخذاً للفتنة ما لم يأمر بمعصية

যদি সত্যি সত্যিই কোন দাস জোরপূর্বক ক্ষমতায় আরোহন করে তবে তার আনুগত্য ওয়াজীব হবে যতক্ষণ না সে পাপ কাজের আদেশ দেয়। কারন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ফিতনা হবে। (ফাতহুল বারী)

মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) এবং তার পর বেশ কিছু খলীফা জোর পূর্বক ক্ষমতায় আসার পরও সাহাবারা যে তাদের আনুগত্য করেছিলেন এ থেকে এধরনেই নীতিই প্রমানিত হয়।

এ তিনটি নীতিই গণতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক শুধু তাই নয় গণতান্ত্রিকরা এগুলোর নিন্দাও করে। তাদের গালি হতে বাচার জন্য এগুলো হতে সরে আসার অনেক চেষ্টা প্রভাবিত মস্তিষ্কের আলেমরা করেছেন। এদের কথায় তুমি ধোঁকায় পড়ো না। এরা তো খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর আলেম। যদি পশ্চিমা প্রভুরা এদের উদ্দেশ্যে বলে,

- অমুক হুজুর নাচতে পারেন না।

পরদিন হতেই তারা কোন একটি সাংস্কৃতি কেন্দ্রে নৃত্য শিখতে আরম্ভ করে দেবেন। মানুষের তিরস্কার তামাশা হতে রক্ষা পাওয়াটা তাদের নিকট জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাওয়ার তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তুমি তাদের দ্বীন ঈমানের বিষয়ে প্রশ্ন করো না। তাদের ঈমান তাদের রুটি-রুজি সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। তার বাইরে ঈমানের আরও কি কি ব্যবহার আছে তা তারা জানে না।

আল্লাহ ও তার রসুল (ﷺ) কোন বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলে দেওয়ার পরও যারা সে বিষয়ে তর্ক করে তারা শয়তান। আর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হল।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
[النور/ ৫১]

যখন বলা হয় আল্লাহ ও তার রসুল ফয়সালা দেবেন তখন একজন মুমিন কেবল এই বলে যে, আমরা শুনছি আর মেনে নিয়েছি। (নূর/ ৫১)

যদিও এধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মুসলিমকে পাশ্চাত্য পরিভাষায় বলা হয় ধর্মাত্মক, গোড়া, মৌলবাদী ইত্যাদি। কথায় বলে এক দেশের গালি আর এক দেশের বুলি। যদি আমাকে কেউ ধর্মাত্মক বলে মৌলবাদী

বলে তবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তার কথা যেন সত্য হয়। আল্লাহ তো আমাদের এমনটিই হতে বলেছেন।

এতক্ষণ আমরা ইসলামে শাসকের ক্ষমতায়ননীতি সংক্রান্ত আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম গণতন্ত্র কেবল একধরনের ক্ষমতায়ন পদ্ধতির অনুমোদন দেয় আর ইসলাম মোটামুটি তিন ধরনের ক্ষমতায়নকে পুরোপুরি বৈধ সাব্যস্ত করে আর চতুর্থ অন্য একটি ক্ষমতায়ন অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও যদি সে পন্থায় কেউ ক্ষমতাস্বত্ব গ্রহণ করে এবং আল্লাহর কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেশ পরিচালনা করে তখন তার আনুগত্য মসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক হয় পদ্ধতি অবৈধ হওয়ার কারণে কর্তৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হবে না। ইসলামের ক্ষমতায়নের পদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ:

১. পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন।

২. পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক কয়েকজন লোককে ঠিক করে দেওয়া যাদের মধ্য হতে পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা মনোনীত করা হবে।

এই দুই প্রকার পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী খলীফার যে অধিকার ইসলাম স্বীকার করে গণতন্ত্র তা পুরোপুরি নাকচ করে।

৩. যদি খলীফা কাউকে মনোনীত না করেই মৃত্যুবরণ করেন তখন মুসলিমদের মধ্যকার আস্তাভাজন আলেমরা একত্রিত হয়ে পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা মনোনয়ন দেবেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পরামর্শ অর্থ ভোটাভোট নয় এবং বেশিরভাগ ভোট যার পক্ষে যাবে তার আনুগত্যই ওয়াজিব হবে তা নই বরং রসুলুল্লাহ (ﷺ) স্পষ্টই বলেছেন যে প্রথম বায়াত যার পক্ষে সম্পাদিত হবে তার আনুগত্যই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ আস্তাভাজন আলেমগণের কম বা বেশি সংখ্যক একটি দল যার হাতে প্রথম বায়াত হবেন তিনিই খলীফা মনোনীত হবেন। ইসলামে আস্তাভাজন আলেম বলতেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত কোন সংসদ সদস্যকে বোঝানো হয় না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রে ফতওয়া দেওয়ার অধিকার দেওয়া যেমন বেমানান। তার চেয়েও বেশি বেমানান জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট খলীফা নির্বাচনের ভার অর্পণ করা।

যাদের পরামর্শের মাধ্যমে খলীফা মনোনীত হবে তাদের গুণাবলী সম্পর্কে আলমাওরুদী বলেন

فَأَمَّا أَهْلُ الْاِخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا .

وَالثَّانِي : الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا .

وَالثَّلَاثُ : الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرِفُ

যারা খলীফা নির্বাচন করবেন তাদের তিনটি গুণাবলী থাকতে হবে

১ পরিপূর্ণ ন্যায় পরায়নতা ও বিশ্বস্ততা ।

২ ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী কে নেতৃত্ব পাওয়ার বেশি যোগ্য তা বুঝতে যে জ্ঞান প্রয়োজন তা বিদ্যমান থাকা ।

৩ কৌশলী ও বুৎপত্তিশীল হওয়া যাতে যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে যুগোপযুগি ব্যক্তিকে নির্নয় করতে সক্ষম হয় ।^(৪১)

তাহলে দেখা যাচ্ছে মাশওয়ারার মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটিও ভোটাভোট হতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র । কারণ

- যারা মাশওয়ারা করছেন তারা জনগনের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য নন বরং ইসলামী জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে বুৎপত্তি রাখেন এমন তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ । বলাবাহুল্য যে, কারা খলীফা নির্বাচিত করবেন তা জনগনের ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা আর যে ব্যক্তি এলাকার বেশি ভোট পায় তাকে চিকিৎসক হিসাবে গ্রহণ করা একই রকম হাস্যকর ।

- এসকল আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও ভোট গ্রহণ করে বেশিরভাগ ভোট যার পক্ষে যায় তিনি খলীফা হবেন এমনটি নই বরং এসকল ব্যক্তি বর্গের একটি অংশ তা সংখ্যায় কম বা বেশি যায় হক না কেন এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে যদি একজনও হয় যার হাতে প্রথম বায়াত হবেন তাকেই কর্তৃত্বশীল খলীফা বলে মেনে নিতে পুরো মুসলিম উম্মাহ বাধ্য হবে ।

আল মাওরুদী বলেন,

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَتَعَقَّدُ إِلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ لِيَكُونَ الرِّضَاءُ بِهِ عَامًّا وَالتَّسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا ، وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بَبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْخِلَافَةِ بِاخْتِيَارٍ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بَبَيْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا

কেউ কেউ বলেছেন প্রতিটি এলাকার আস্থাভাজন আলেমদের বহুসংখ্যকের সমর্থন ছাড়া বায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না যাতে করে সবার নিকট খলীফা সহজে গ্রহণযোগ্য হন । এই মত পরিত্যক্ত, কারণ আবুবকর (রাঃ) এর বায়াতে যারা উপস্থিত ছিল কেবল তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল যে উপস্থিত নেই তার উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়নি । (আল আহকাম আসসুলতানিয়াহ)

ইমাম আল কুরতুবী বলেন,

فَإِنْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فَذَلِكَ ثَابِتٌ وَيَلْزَمُ الْغَيْرُ فَعَلَهُ ، خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ حَيْثُ قَالَ : لَا تَتَعَقَّدُ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَدَلِيلُنَا أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَقَدَ الْبَيْعَةَ لِأَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يَنْكُرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ

(৪১) আলআহকাম আসসুলতানিয়াহ

যদি আস্থাভাজন আলেমদের মধ্যে একজনও কারও হাতে বায়াত হয় তবে তার সে বায়াত গ্রহণযোগ্য হবে এবং অন্য সবার উক্ত ব্যক্তির হাতে বায়াত হওয়া বাধ্যতামূলক হবে। কিছু লোক যে বলেছে একজনের বায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না বরং একদল লোক যার হাতে বায়াত হবে তার বায়াত গ্রহণযোগ্য হবে এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের দলীল হল উমর (رضي الله عنه) যে একা আবুবকরের হাতে বায়াত হয়েছিলেন এটা কেউ অপছন্দ করেনি। (তায়সীরে কুরতুবী)

তিনি আরও বলেন,

، قال الامام أبو المعالي: من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد لزمته، ولا يجوز خلعها من غير حدث وتغير أمر، قال: وهذا مجمع عليه

ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী বলেন যদি একজনও কারও হাতে বায়াত হয় তবে তা বাধ্যতামূলক হবে কোন কারন ছাড়া (যেমন বায়াতকৃত ব্যক্তির কাফির হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) উক্ত ব্যক্তির বায়াত ভঙ্গ করা জায়েজ হবে না। তিনি বলেছেন এর উপর ইজমা হয়েছে (তায়সীরে কুরতুবী)

আর এটা সম্ভব হবে সেই আস্থার উপর নির্ভর করে ঈমান ও তাকওয়ার কারনে যে আস্থা মুসলিমদের একে অপরের উপর বিভিন্ন বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আস্থাশীল করে তোলে। ঈমান ও তাকওয়ার স্বাদ যারা পায়নি তারা এধরনের ব্যবস্থাকে অপূর্ণ ও অবাস্তব মনে করতে পারেন কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এ ব্যবস্থাতেই বহুকাল অর্ধধরনী শাসিত হয়েছে।

৪ . যখন কেউ জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করে এবং কিতাব ও সুন্নাহের আইন প্রতিষ্ঠা করে তার আনুগত্য ওয়াজিব হবে। কারন ইসলাম কর্মকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন খলীফা ক্ষমতায়নের ৪টি পদ্ধতিই গণতন্ত্রের সাথে পুরোমাত্রায় সাংঘর্ষিক। এরপরও যারা ইসলামের সাথে গণতন্ত্রকে মিলাতে চান তাদের বলি আপনারা এককাজ করুন, আপনাদের “ইসলামী গণতন্ত্রের” প্রথমাংশ বিলুপ্ত করে শুধু গণতন্ত্র বলুন তাহলে আমাদের সাথে আপনাদের সকল বিরোধ শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনারা গণতন্ত্রের জনকদের সাথে মামলা লড়ে ঠিক করে নেবেন গণতন্ত্র নাম ব্যবহার করার অধিকার কে বেশি রাখে যারা গণতন্ত্র তৈরী করে বাজারজাত করেছে তারা নাকি আপনাদের মত খুচরা খরিদাররা। আমরা দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন সে মামলাতে আপনাদের নাস্তানাবুদ করেন। কারন একটা কুফরী নাম কাফেররা ব্যবহার করলেই মানানসই হই আপনাদের মত দাড়ি টুপি ওয়ালারা ব্যবহার করলে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়, জন সাধারণ বিভ্রান্ত হয়। মুসলিম সমাজে অশান্তি হয়।

খলীফার ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত আলোচনার পর আমরা এবার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত আলোচনাতে প্রবেশ করব ইনশাআল্লাহ।

<# খলীফার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ #>

২. খলীফার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء/৫৭]

হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর তার রসুলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয় তবে তা আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটাই উত্তম আর পরিণামের দিক থেকে এটাই শ্রেয় (নিসা ৫৯)

এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয় তবে তা আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও আয়াতের এই অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আল্লাহ ও তার রসুল যা কিছু বলেছেন তার বিরুদ্ধে না যাওয়া পর্যন্ত আমীরের আনুগত্য করতে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন।

এ বিষয়টিই রসুলুল্লাহ (ﷺ) এভাবে ব্যাখ্যা করছেন

« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ »

একজন মুসলিমের উপর অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে আমীরের আনুগত্য করে যাওয়া তার পছন্দ হক বা অপছন্দ হক যতক্ষণ না তাকে পাপ কাজের আদেশ দেওয়া হয় অতএব যখন পাপ কাজের আদেশ দেওয়া হয় তখন কোন আনুগত্য নেই।^(৪২)

طاعة الإمام على المرء المسلم ؛ ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له

একজন মুসলিমের উপর খলীফার আনুগত্য ফরজ যতক্ষণ না তাকে পাপ কাজের আদেশ দেওয়া হয় যখন পাপ কাজের আদেশ দেওয়া হয় তখন কোন আনুগত্য নেই^(৪৩)

প্রদত্ত আয়াত ও হাদীস স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, একজন খলীফার হাতে বায়াত হওয়ার পর হতে পুরো মুসলিম বিশ্ব তার আনুগত্য করতে বাধ্য থাকে। বৃদ্ধ, যুবক, নারী, পুরুষ, আলেম, মাওলানা সবাই ইসলামের খলীফার যে কোন নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। তার আদেশ বুঝে আসুক বা না আসুক পছন্দ হোক বা না হোক। যদি কেউ তার আদেশের বিরুদ্ধে যায় তবে সে পাপী হবে। এমনকি ব্যক্তিগত

(৪২) বুখারী কিতাবুল আহকাম বাবু আসসামউ ওয়া আততাতু লিল ইমাম মা লাম তাকুন মা' সিয়াতান মুসলিম কিতাবুল ইমারা বাবু উযুবু তায়াতিল উমারা ফি গয়রি মা'সিয়াতিন

(৪৩) (সিলসিলাতু আসসাহিহাতে আলবানী হাসান বলেছেন)

ব্যাপারে পর্যন্ত খলীফার আনুগত্য প্রযোজ্য। হযরত আবুযারের সাথে যখন যাকাতের ব্যাপারে বেশ কিছু সাহাবার দ্বিমত হল তখন উসমান (রাঃ) তাকে নির্জনে বসবাস করতে বললেন তার নির্দেশে আবুযার (রাঃ) জনবসতি পূর্ণ এলাকা ছেড়ে নির্জনে বসবাস শুরু করলেন একাধিনী বর্ননার পর আবুযার (রাঃ) বলেন,

فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت

উসমানের নির্দেশেই আমি এখানে বসবাস করছি যদি একজন হাবসী গোলামও আমার উপর নেতৃত্ব পায় তবু আমি তার আনুগত্য করতে থাকব। (বুখারী)

একজন মুসলিম কোথায় বসবাস করবে এধরনের ব্যক্তিগত বিষয়েও একজন খলীফার আনুগত্য ওয়াজিব হয়। অবশ্যই খলীফার নির্দেশ আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধে গেলে তা মানা যাবে না। খলীফার ক্ষমতা কেবল মাত্র কোরআন হাদীসের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ। কোরআন হাদীস ছাড়া অন্য কিছুই তিনি মানতে বাধ্য নন। এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি।

অনেকে এধরনের নীতিকে ডিস্টেন্ডেশীপ বা সৈরতন্ত্র মনে করেন। আমরা বলি এটা আমাদের খেলাফত। না গণতন্ত্র না সৈরতন্ত্র। যারা আমাদের মত সাহসী নন তারা অবশ্য এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে বাচার সহজ রাস্তা হিসাবে আল্লাহ ও রসুল প্রদত্ত খেলাফতের ক্ষমতাকে বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধ করে গণতন্ত্র সম্মত করতে চেয়েছেন। খলীফা নাকি শুরা কমিটির অধিকাংশের মত মানতে বাধ্য থাকবেন! শুধু তাই নয় শুরা কমিটির সদস্যরা নাকি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন! যদি কারও কৌতুক করার ইচ্ছা থাকে তবে এসব কথা বন্ধুদের শোনাতে পারেন। আমার তো ভয় হয় কবে হয়তো শুনব পন্ডিতবর্গ ফতওয়া দিয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদেরও খলীফা ও শুরাকমিটির সদস্য নির্বাচনে ভোটের অধিকার দেওয়া হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ আর খৃষ্টানদের মহাজোটের বিপুল সংখ্যক ভোটে একজন হিন্দু খলীফা নির্বাচিত হওয়াটাও তখন অসম্ভব কিছু হবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম খলীফা! কথাটি যতটুকু অসঙ্গতি লাগছে ইসলামী গণতন্ত্র ঠিক ততটাই অসঙ্গতি পূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্রকে রামরাজ্যে পরিনত করার সহজ কৌশলই হল ইসলামী গণতন্ত্র। এসকল কুপমুণ্ডকরা টুপি জোকা পরে যেভাবে বাতিলের প্রচার প্রসারে শুরু শরীর ঘর্মান্ত করছে তাতে ইবলিস যে নাকে তৈল দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে বোধকরি তা আপনাদের বোধগম্য হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন,

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ [الشورى/৩৮]

তাদের কাজসমূহ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় (শুরা/৩৮)

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [آل عمران/১৫৭]

আর হে নবী তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো কিন্তু যখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহন করো তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো নিশ্চয় আল্লাহ যারা তার উপর ভরসা করে তাদের ভাল বাসেন। (আলে ইমরান ১৫৯)

এই দুটি আয়াতে যে, মাশওয়ারা করতে বলা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী গনতন্ত্রের প্রস্তাবকেরা যা কিছু বলার বলেছেন। আমরা মশওয়ারার অর্থ পূর্বেই বর্ণনা করেছি এখানে কেবল এতটুকু বলব,

* খলীফা বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন এটাই ইসলামের নীতি। তবে কোন্ বিষয়ে কার নিকট পরামর্শ করবেন তা সম্পূর্ণভাবে তার উপর নির্ভর করে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তিনি কারও মত মানতে বাধ্য নন সকলে তার মত মানতে বাধ্য। এ বিষয়টিই সুরা আলে ইমরানের আয়াতটিতে বলা হয়েছে আল্লাহ বলছেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো কিন্তু যখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহন করো তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো।
(আলেইমরান ১৫৯)

আলকুরতুবী বলেন,

والشورى مبنية على اختلاف الاراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب، وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية.

পরামর্শের ফলে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা দেবে পরামর্শকারী এসকল মতের মধ্যে কোরআন সুন্নার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী কোনটি তা লক্ষ্য করবেন যদি আল্লাহ তার নিজ অনুগ্রহে কোন একটি মতকে তার নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হিসাবে দেখান তবে সে আল্লাহর উপর ভরসা করে সেটিই বাস্তবায়িত করবে যেহেতু সত্যের সন্ধানে যতটুকু চেষ্টা করা যায় সে তা করেছে। আল্লাহ তার রসুলকে এই আয়াতে তাই শিক্ষা দিয়েছেন।

(তাফসীরে কুরতুবী)

ইবনে বাত্তাল বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন,

ولو لم يكن في المشاورة إلا استئلاف النفوس، وإظهار المفاوضة والثقة بالمستشار لعلمه أن يبدو من الرأى لم يـ
ظهر. وأما العزيمة والعمل فألى الإمام لا يشركه فيبدأ لقوله تعالى: {فإذا عزمْتَ فتوكل على الله} فجعل العزيمة إليه، وجعله مشاركاً في الرأى لغيره. وفي هذا من الفقه: جواز مشاورة غير الوزير إذا كان ممن يظن عنده الرأى والمعرفة

মাশওয়ারার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নই শুধু মাত্র যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে তাকে খুশি করা তার জ্ঞানের কারনে তার প্রতি আস্থা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা। হয়ত সে এমন নতুন প্রস্তাব পেশ করবে যা পূর্বে কারও মনে উদয় হয়নি। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পুরোপুরিভাবেই খলীফার উপর নির্ভর করবে। এবিষয়ে কেউ তার ক্ষমতায় ভাগিদার নই কারন আল্লাহ বলেন (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) যখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। (ইবনে বাত্তাল কৃত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা)

সুতরাং পরামর্শ গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন খলীফা নিজে। তিনি যে রায় দেবেন তা মানতে যাদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং অন্যান্য মুসলিম জনসাধারণ বাধ্য থাকবে। এটা ছাড়া অন্য কোন নীতি ইসলাম চেনে না। খোলাফায়ে রাশেদার কর্ম পন্থায়ও এ ছাড়া কিছু খুজে পাওয়া যাবে না। যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং উসামার বাহিনী প্রেরণের সময় অন্য সকলের পরামর্শ উপেক্ষা করে আবু বকর (রাঃ) নিজ রায় ঘোষণা করেছিলেন তা মানতে অন্যান্যরা বাধ্য ছিল। উমর (রাঃ) এর মৃত্যুশয্যায় যখন বিশিষ্ট সাহাবীরা তাকে বলল আপনি পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে যান তিনি বললেন আমি চাইলে তা করতে পারি চাইলে নাও করতে পারি যদি সত্যি সত্যিই শুরাকমিটির বেশিরভাগের রায় মানতে খলীফা বাধ্য থাকতেন তবে এমন কথা কি সাজে? সুতরাং ইসলামের খলীফাকে কুফরী গনতন্ত্রের বন্ধনে শৃঙ্খলিত করার এ অপপ্রয়াস হতে আমরা আপনাদের সতর্ক করছি।

* সকল বিষয়েই পরামর্শ করতে হবে এমন নই ইচ্ছা করলে কারও সাথে পরামর্শ না করেই কোন কোন বিষয়ে খলীফা কেবল আদেশ শুনিতে পারেন। আল্লাহ বলেছেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো কিন্তু যখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো।
(আলেইমরান ১৫৯)

ইবনে আব্বাস আয়াতটি এভাবে পড়েছেন,

قال قرأ بن عباس : وشاورهم في بعض الأمر

কোন কোন বিষয়ে আপনি তাদের সহিত পরামর্শ করুন (৪৪)

* খলীফা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য নন বরং যে বিষয়ে তিনি যাকে যোগ্য মনে করবেন তার সাথে পরামর্শ করবেন।

وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد

(৪৪) আদাবুল মুফরাদ, তাফসীরে কুরতুবী আলবানী সহীহ বলেছেন।

ইবনে খুওয়াইজ আল মিনদাদ বলেন আমীরদের উপর ওয়াজিব যে, তারা দিনের যে সব বিষয়ে জানেননা সেসব বিষয়ে আলেমদের সাথে, যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেনা কমান্ডারদের সাথে, জনকল্যানমূলক কাজে জননেতাদের সাথে এবং দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়ে কর্মচারী মন্ত্রী ও কাতেবদের সাথে পরামর্শ করবেন।^(৪৫)

অবাক না হয়ে পারা যায়না যখন দেখি কার সাথে পরামর্শ করা হবে তা জনগনের ভোটে নির্বাচিত করতে বলা হচ্ছে। সুফইয়ান ছাওরী বলেন,

قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله

তুমি কেবল তাদের সহিত পরামর্শ করো যারা তাকওয়ার অধিকারী ও বিশ্বস্ত এবং আল্লাহকে ভয় করে।
(৪৬)

ইমাম আল বুখারী বলেন,

وَكَانَتِ الْأُئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَشِيرُونَ الْأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ؛ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পরও মুসলিমদের নেতারা আস্তাভাজন আলেমদের সাথে পরামর্শ করতেন যাতে করে মুবাহ বিষয় সমূহের মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠটি গ্রহণ করা যায়।

(সহীহ বুখারী)

وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا

কোরানের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উমর (رضي الله عنه) এর নিকট বসতেন ও পরামর্শ দিতেন তারা যুবক হন বা বৃদ্ধ হন।

(সহীহ বুখারী)

অতএব পরামর্শ করা হবে কেবল বিশ্বস্ত তাকওয়াবান ও ইলমের অধিকারীদের সাথে। যেমন রোগী ডাক্তারের নিকট পরামর্শ করে। যদি ৮০% ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের নিকট জুরের চিকিৎসাও চাওয়া হয় সেটা বোকামী হবে। এসকল জ্ঞানপাপীদের বোকামী কোন্ পর্যায়ে যারা রাষ্ট্রীয় কর্মে পরমর্শদাতাদের সাধারণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত করার পরামর্শ দিচ্ছেন? বরং খলীফা নিজে তার

(৪৫) তাফসীরে কুরতুবী ও ফাতহুল কাদীর

(৪৬) ইবনে বাত্তালের বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ও তাফসীরে কুরতুবী।

চেনা পরিচিত লোকদের ভিতর কে বিশ্বস্ত ও জ্ঞানের অধিকারী তা ঠিক করে নেবেন। ইবনে আব্বাস বলেন,

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون في { إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا } حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا فقال لي يا ابن عباس أأذلك قولك ؟ قلت لا قال فما تقول ؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له { إذا جاء نصر الله والفتح } فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا } . قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم

উমর (রাঃ) আমাকে তার বৈঠকে প্রবেশ করতে দিতেন যেখানে বদরের বয়স্ক সাহাবারা থাকতেন তাদের মধ্যে কেউ একদিন বললেন কেন আপনি এই ছেলেকে আমাদের মজলিসে প্রবেশাধিকার দেন? সে তো আমাদের ছেলের বয়সের। উমর (রাঃ) বললেন সে কে আপনারা তো জানেনই। পরে একদিন উমর (রাঃ) তাদের ডাকলেন আমাকেও ডাকলেন আমার মনে হয় তিনি তাদের আমার জ্ঞান দেখাতে চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন আল্লাহ বলেছেন (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আল্লাহর তাসবীহ করুন এবং তার নিকট ক্ষমা চান এভাবে তিনি সুরা নাসরের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে আপনাদের কি মত? তারা কেউ কেউ বললেন আল্লাহ আমাদের আদেশ করছেন যে, যখন আমাদের তিনি বিজয় দেন আমরা যেন তার প্রশংসা করি ও তার নিকট ক্ষমা চাই কেউ কেউ বললেন আমরা জানিনা কেউ কেউ পরিপূর্ণ নিরাবতা অবলম্বন করলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন উমর (রাঃ) আমার উদ্দেশ্যে বললেন তুমিও কি এমন বল নাকি ওহে ইবনে আব্বাস। আমি বললাম না বরং এ সুরাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মৃত্যুর সময় ঘোষণা করা হয়েছে যখন বিজয় আসবে (إذا جاء نصر الله والفتح) অর্থ মক্কা বিজয় অর্থাৎ রাসুলকে বলা হয়েছে মক্কা বিজয়ই আপনার মৃত্যুর আলামত অতএব তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসা করুন ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উমর (রাঃ) বললেন আমিও এমনটিই মনে করি।⁽⁸⁷⁾

অতএব ইবনে আব্বাসকে মজলিসে গুরাতে বসানোর জন্য উমর (রাঃ) কারও পরামর্শ নেননি জন ভোটের আয়োজনও করেননি বরং তার জ্ঞানের কারনেই তিনি তাকে বাছাই করেছেন। যখন তারা অভিযোগ করল তিনি তার জ্ঞান ও দক্ষতার প্রমাণ পেশ করলেন। গুরা সদস্য হওয়া যায় ইসলামী জ্ঞান ও তাকওয়ার মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে নই। খলীফাই ভাল বুঝতে পারবেন তার নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে কে বেশি

(87) বুখারী কিতাবুত তাফসীর সুরাতুন নাছর

জ্ঞানী বেশি তাকওয়াবান। ফলে তিনিই ঠিক করে নেবেন কখন কার সাথে কি বিষয়ে পরামর্শ করবেন।

<# খলীফাকে অপসারণ #>

৩. খলীফাকে অপসারণ

বোধ হয় রাক্ষস রাজ্য হতে আমদানি করা মতবাদের এটাই চুম্বক অংশ। যারা গনতন্ত্রের ধ্যানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রয়েছেন খলীফার অপসারণ শব্দটি কতখানি আশ্চর্যজনক তা বুঝার ক্ষমতা তাদের থাকার কথা নয়। খলীফা জীবদ্দশায় যে আদেশ করে যান তার মৃত্যুর পরও তা পালন করতে হয় এমন দর্শনে বিশ্বাসী সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنه) যদি শুনতেন খলীফা জ্ঞান, ঈমান ও সুস্থ প্রানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তবে আপনার কি মনে হয় না যে, খোলা তরবারি আঘাতে এদের রঙ্গলিলা সাজ করে দিতেন? যে খারেজীদের সম্পর্কে আবু উমামা (رضي الله عنه) বলেন (كَلِمَةً رَأَى رَأَى) “জাহান্নামের কুকুর” তারা কিছু নতুন মতবাদ আনয়ন করেছিল ঠিকই কিন্তু এ ধরনের পরশ পাথর তারা কোথায় পাবে? পূর্বে যা কিছু ভ্রান্তি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো প্রমাণ করার জন্য কিছু না কিছু দলীল তারা বহু কষ্ট করে হলেও পেশ করা হয়েছে আমরা সেগুলোর সঠিক অর্থও বর্ণনা করেছি। কিন্তু খলীফাকে ৫ বা ১০ বছর পরপর বহিষ্কার করার দলীল কেবল এরিস্টোটলের দ্যা রিপাবলিকান থেকেই দেওয়া সম্ভব। বলে রাখা ভাল আমরা উক্ত লেখকের প্রস্তাবিত বাতিল মতবাদের তিল পরিমাণ গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নই।

চার খলীফা খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে আমৃত্যু বহাল ছিলেন। আজ পর্যন্ত বিশ্বের যে প্রান্তেই ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা এই নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্থানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও এমনই ছিল। যে নীতি কখনও ঘটেনি, মুসলিমরা যার সাথে পরিচিত নই শুধুমাত্র গনতন্ত্রের জয়গানে হন্যে হয়ে তার সাফায় গাওয়া সাপের মত খোলস পাল্টাতে অভ্যস্ত যারা তাদের ক্ষেত্রেই সাজে। যতদিন গনতন্ত্রের বাজার রমরমা থাকবে সে বাজারে বিক্রি হওয়ার মত লোকও থাকবে। আকবারের দিনে ইলাহির পক্ষেও ততসময়ের আলেমরা সাফায় গেয়েছে। তাই সাফায় গাওয়া আলেম শেষ হয়ে যাবে তা আমরা আশা করি না আমরা কেবল চাই এদের মুখোস খুলে যাক।

ইসলামে একবার খলীফা হওয়ার পর আর তাকে বহিষ্কার করা যায় না।

ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী বলেন,

قال الامام أبو المعالي: من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد لزمته، ولا يجوز خلع من غير حدث وتغير أمر، قال: وهذا مجمع عليه

আস্থাজন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ব্যক্তিও যার হাতে বায়াত হয় সে নেতৃত্ব পেয়ে যায় কোন কারন ছাড়া (যেমন কুফর) তাকে বহিষ্কার করা জায়েজ নেই এর উপর ইজমা হয়ে গেছে। (তাকসীরুল

কুরতুবী)

كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَهْلِ الْاِخْتِيَارِ عَزْلُ مَنْ بَايَعُوهُ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ

শুধু সদস্যদের জন্য জায়েজ নেই যে, যার হাতে একবার বায়াত হয়ে যাবে তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হওয়া ছাড়াই তাকে বহিষ্কার করার।

(আলআহকাম আসসুলতানিয়াহ)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً بِيَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِئْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخَرِ

যদি কেউ কারও হাতে হাত রেখে বায়াত হয় তবে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক যদি অন্য কেউ তার নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয় তবে তাকে হত্যা করো (মুসলিম)

যার হাতে প্রথম বায়াত সম্পন্ন হয়েছে তারই আনুগত্য করতে হবে যদি পরে কেউ উক্ত খলীফার বহিষ্কার দাবি করে তাকে হত্যা করতে হবে এটাই রসুলের নির্দেশ। তাহলে তাদের অবস্থা কি যারা প্রতি পাচ বছর পরপর খলীফার বহিষ্কার দাবি করছেন, তাদের কয়বার হত্যা করা দরকার?

প্রস্তাবিত গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্র কত দূরতর সম্পর্ক রাখে আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে তা বোঝা যাবে। যারা পাশ্চাত্য প্রস্তাবিত প্রকৃত গণতন্ত্রকে বিকৃত করে ইসলাম সম্মত করার আশ্রয় চেষ্টা করেছেন তাদের চেষ্টার শেষটা এই যে, তেলে জলে মিশ্রন করে তারা হাজির করেছেন এক ভেজাল মতবাদ। দুধের সাথে জল মেশালে ভেজাল দুধ বলা হয় ভেজাল জল বলা যায় না। ইসলামী দর্শনের সাথে কুফরীকে মেশানোর যতই চেষ্টা করা হক ইসলাম বিকৃত করাও সম্ভব হয় না ভেজাল ইসলাম জাতিয় কোন ইসলামও উদ্ভব হয় না। আল্লাহ ইসলামকে কোরআন হাদীসের ছিপি দ্বারা মহরাক্কিত করে দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত না কিছু ঢোকানো যাবে আর না কিছু বের করা যাবে। এসকল পন্ডিতরা কেবল পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রকেই কাদাজলে ঘুলিয়ে ছেড়েছেন। তারা বাজারজাত করেছেন ভেজাল গণতন্ত্র। তবে আমরা সঙ্কিত কারন এই ভেজাল গণতন্ত্রকেই ইসলামী গণতন্ত্রের নামে বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমরা শুধু চেষ্টা করছি যাতে এর নাম হতে ইসলাম শব্দটা সযত্নে তুলে নেওয়া যায়। ওনাদের বলি আপনারা এই অপবিত্র নামটির পাশে ইসলাম শব্দ ব্যবহার করার মত নিকৃষ্ট কাজ হতে বিরত হলে আমরা তাওহীদী জনতা আপনাদের উপর (অন্তত এ কারণে) যারপরনায় সন্তুষ্ট হব। যদি আপনাদের মতবাদটির জন্য কোন নাম খুজে না পান তবে আমরা একটা নামের প্রস্তাব করি গণতন্ত্র আর শত শয়তানী তন্ত্র মন্ত্র একত্রিত করে আপনারা যে দুর্লভ বস্তুটি আবিষ্কার করেছেন তার নাম ইসলামী গণতন্ত্র না হয়ে “পাচমেশালী গণতন্ত্র” হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। আশা করি আমাদের প্রস্তাবিত নামটি আপনাদের পছন্দ হবে।

<# ভেজালেও মেশাল্ #>

একজন দুধ বিক্রেতা গ্রামের গোয়ালাদের কাছ থেকে দুধ ক্রয় করে শহরে এক চায়ের দোকানে বিক্রয় করে। আশেপাশের কয়েক ঘরের লোক চায়ের দোকানীর কাছ থেকে চড়া মূল্যে সেই গো দুধ ক্রয় করে। চায়ের দোকানীর কাছ থেকে যারা দুধ ক্রয় করত তাদেরই একজনের বাড়িতে গ্রাম্য এক মেহমান ২ লিটারের কোকা কোলার বোতল ভর্তি করে সদ্য দহন করা খাটি দুধ হাদীয়া সরূপ নিয়ে আসার পর বোঝা গেল তারা এতদিন দুধ মনে করে যা পান করেছেন তা আসলে সাদা পানি টাইপের ভিন্ন একটি পানীয়। সকলে মিলে চায়ের দোকানীর উপর চড়াও হলে সে বলে ,

- দুধ পানি না হয়ে যায় কোথায়! গোয়ালো জলে ঢেলে দুধআলাকে দেয় দুধআলা তাতে দ্বীগুন জল মিশিয়ে আমাকে দেয় আমি সে দুধটুকু জল ভর্তি পাত্রে ঢেলে রাখি।

তার মুখে সব শুনে গ্রাম্য মেহমানটি বলে ,

- এখানে দেখছি ভেজালেও মেশাল্

পশ্চিমা প্রভুদের অনুগত পাচমেশালী গনতন্ত্রের প্রবর্তকেরা এখন এক নতুন পায়তারা শুরু করেছেন। তারা বেজায় গর্বের সাথে বলে বেড়াচ্ছেন,

- আমরা তো গণতন্ত্রকে কুফরীই মনে করি। আমরা গণতন্ত্র মানি না। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে এবং কৌশলগত কারনে গনতান্ত্রিক পন্থায় ভোটাভোট করছি মাত্র।

এভাবে ভোটাভোট করতে করতে যদি আকস্মাৎ কোনদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে যান সেদিন নাকি তারা সাহসা আকাশ পাতাল পরিবর্তন করে ফেলবেন। দেশের সংবিধান কোরআন হবে, ইসলামী বিধান হবে ইত্যাদি। ছেড়া কাথায় শুয়ে কেবল চাদ ধরা নই চাদকে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে আসার কল্পনা। জ্ঞানে অজ্ঞানে যাদের জয়গানে জীবন পাত করছে এবার তাদেরই ফাকি দেওয়ার চেষ্টা। কথায় বলে গুরুর সাথে গোড়ামী। যায় হোক যারা গনতান্ত্রিক পন্থায় মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য খাটাখাটি হাটাহাটি করছেন তাদেরকে আমরা বলব,

প্রথমত গণতন্ত্র কুফর শিরকে পরিপূর্ণ একটি দর্শন। সাধারণ জনগন এর চাতুর্যতাপূর্ণ স্লোগানে মুগ্ধ হয়ে দীন ঈমান খুইয়ে বসছে। কুফর ও শিরকের ধ্বংস সাধনের জন্য যে জাতির আবির্ভাব সে জাতিকেই শিরক কুফরের প্রতি নমনীয় সহনীয় শুধু নয় বরং শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে এই কুফরী দর্শন। শত শত ভুল আকীদা বিশ্বাস মুসলিম যুবকদের মস্তিষ্ক অভ্যন্তরে প্রবেশ করাচ্ছে। জনসাধারণের ঈমান নানান উপায়ে নষ্ট করে ফেলার মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের নাস্তিক বানিয়ে ছাড়ছে। আপনাদের প্রশ্ন করি যদি সত্যিই এই ব্যাবস্থাকে কুফরী মনে করেন তবে ধরা পৃষ্ঠ থেকে এর ত্বরী বিনাশ চান কিনা? যেভাবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ

আমিই বিনাশকারী আল্লাহ আমার মাধ্যমে কুফরীকে বিনাশ করবেন (বুখারী)

এ ব্যাবস্থার ক্ষতি হতে মুসলিম জনসাধারণকে বাচানোর কার্যকরী উপায় কি বলে মনে করেন? এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া নাকি কাজে কর্মে নিজেদের গনতান্ত্রিক প্রমাণ করা আর অন্তরে অন্তরে এটাকে কুফরী জেনে ঘৃণা করা? যেসব নবী রাসুলেরা কুফর শিরকের ধ্বংস সাধনের জন্য জীবনের পুরো অংশ ব্যয় করেছেন তাদের কর্ম পন্থা কোনটি ছিল?

<# কুফরীকে মেনে নিয়ে ইসলামী আন্দোলন সম্ভব নয়। #>

ওনারা বলেন,

- আমরা তো গণতন্ত্রকে ঘৃণাই করি তবে যেহেতু এখন গণতন্ত্র ছাড়া জনসমাজে কোন গ্রহণযোগ্যতাই পাওয়া যাচ্ছেনা তাই এটাকে খোলোস হিসাবে ব্যবহার করছি মাত্র যখনই সমাজে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা চলে আসবে, জনগণ আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসাবে বিন্দু মাত্র অপেক্ষা না করে আমরা নবুওতী ধারার, খেলাফতী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করব।

তাদের এ বাতুলতা না শরীয়ত সম্মত আর না বাস্তব সম্মত।

শরীয়ত সম্মত নই কারন রসুলুল্লাহকে এধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তিনি তা গ্রহন করেননি। স্বয়ং রব্বুল আলামীন ওহীর মাধ্যমে তাকে এ থেকে কড়া ভাবে নিষেধ করেছিলেন।

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [الفلم/ ৭]

কাফিররা চায় যে, তুমি কিছু ছাড় দিলে তারাও ছাড় দেবে (কলাম/ ৯)

وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَتَّخِذُوكَ حَلِيلًا (৭৩) وَلَوْ لَأَنَّ بَيْنَكَ لَقَدْ كَذَبْتَ
تُرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (৭৪) إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا [الإسراء/ ৭৩-৭৫]

তারাতো আপনাকে আমার নির্দেশ হতে সরিয়ে নিতেই চেয়েছিল যাতে আপনি আমার উপর মিথ্যারোপ করেন তাহলে তারা আপনাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহন করত। যদি আমি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম তবে তো আপনি তাদের ডাকে হয়তো কিছু না কিছু প্রভাবিত হয়ে যেতেন। তা করলে আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে দ্বিগুণ শাস্তির সম্মুখিন করতাম আর আমার বিরুদ্ধে আপনাকে কেউই কোন সাহায্য করতে পারত না (বনী ইসরাঈল ৭৩-৭৫)

কাফিরদের কিছু অন্যায় আবদার রক্ষা করলে তারা রসুলুল্লাহকে বন্ধু হিসাবে গ্রহন করতে রাজী ছিল তাদের সেই অন্যায় আবদার সম্পর্কে আততাবারী বিভন্ন মত উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এও একটি যে, মুজাহিদ বলেন,

عن مجاهد قال: قالوا له: انت آلهتنا فامسسها

কাফিররা রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলল আমাদের উপস্যদের নিকট এসে তাদের স্পর্শ করুন। (তাফসীরে তাবারী)

চিন্তা করুন, এতটুকু করলেও তারা সম্ভ্রষ্ট হত এবং রসুলুল্লাহর প্রতি নমনীয় হত। কিন্তু আল্লাহ তার রসুলকে রক্ষা করলেন এবং ভীষন ভাবে সতর্ক করে বললেন যদি আপনি তাদের প্রস্তাবে অঙ্গ কিছুও প্রভাবিত হতেন আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে দ্বিগুন শাস্তিতে নিষ্কিণ্ড করতাম।

কাফিরদের কুফরীর ব্যাপারে নমনীয় আচরন করা তো অকল্পনীয় ব্যাপার এর চেয়েও তুচ্ছ ব্যাপারে রসুলুল্লাহকে কাফিরদের প্রভাব হতে পুরোপুরি মুক্ত থাকার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে আল্লাহর রসুল (ﷺ) একজন কাফির নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন সে সময় সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাখতুম যিনি পূর্বেই মুসলিম হয়েছিলেন এবং দরিদ্র ও অন্ধ ছিলেন হাজির হয়ে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার উপর বিরক্ত হলেন। তিনি চাচ্ছিলেন উক্ত মুশরিক নেতাটি যদি মুসলিম হয়ে যায় তবে তার অনুসারী অনেকে মুসলিম হয়ে যাবে এভাবে ইসলাম শক্তিশালী হবে। এ ঘটনার কারনে আল্লাহ তাকে সতর্ক করে নাযিল করেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى (۱) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (۲) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى (۳) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (۴) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (۵)
فَأَن تَلَهُ تَصَدَّى (۶) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى (۷) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (۸) وَهُوَ يَخْشَى (۹) فَأَن تَعْنَهُ تَلْهَى (۱۰) كَلَّا
إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (۱۱) فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ (۱۲) [عبس/ ১-১২]

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া করলেন এবং মুখ ফিরাইয়া নিলেন কারন তার নিকট একজন অন্ধ আগমন করেছে। তুমি তো জানো না হয়তো সে পবিত্র হত অথবা উপদেশ গ্রহন করত ফলে তোমার উপদেশ তার কাজে আসত। যে অহংকার করে তুমি তার প্রতি মনোনিবেশ করো আর যে তোমার কাছে ছুটে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে তুমি কি তার থেকে মুখ ফিরাইয়া নাও? কখনও নই এটাতো উপদেশ বানী মাত্র যে চায় উপদেশ গ্রহন করুক। (আবাসা ১-১২)

কোন কোন কাফির নেতা ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে রসুলুল্লাহর নিকট আসতো তখন তার চারপাশে হতদরিদ্র ও দুর্বল সাহাবারা বসে থাকতেন। তারা বলল হে মুহাম্মদ যখন আমরা আসি তখন অন্তত আপনি এদের আপনার নিকট হতে উঠে যেতে বলবেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তেমনটি করতেও চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন সতর্ক করলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ [الأنعام/ ৫২]

আপনি অবশ্যই তাহাদের আপনার নিকট হতে বিতাড়িত করবেন না যারা সকাল সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে এবং তারই সম্ভ্রষ্ট প্রার্থনা করে তাদের হিসাব আপনার উপর নই আপনার হিসাবও তাদের উপর

নই যদি আপনি তাদের বিতাড়িত করেন তবে ভীষন অপরাধি হবেন। (আলআনআম - ৫২)

সুতরাং কাফিরদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য সামান্য থেকে সামান্য কোন কাজও ইসলাম সম্মত নই।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উম্মতের উপরও এই একই বিধান। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (رضي الله عنه) বলেন

عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فإِشْنَلَا مَرَكَلَاوْ وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا تُمْ

আমরা আল্লাহর রসুলের হাতে বায়াত হয়েছিলাম এই শর্তে যে, আমরা পছন্দ হক আর না হক আমীরের আনুগত্য করব নেতৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি করব না আর যেখানেই থাকি হকের উপর টিকে থাকব বা হক কথা বলব আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করব না।^(৪৪)

আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল অত্যাচারী বাদশার সামনে সত্য কথা বলা^(৪৫)

কাফিরদের সাথে আপোষ করে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) ও সমস্ত নবীরাসুলদের পছন্দ পরিত্যাগ করার কারণে ভীষন অপরাধে অপরাধী। কুফর শিরকের মোকাবিলায় একজন মুসলিম কেবল স্পষ্ট শত্রুতা ও প্রকাশ্য বিরোধিতার পথই গ্রহণ করতে পারে। যদি শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব থাকে তবে ক্ষেত্র বিশেষে নিরব থাকা বৈধ বটে কিন্তু কৌশলের দোহায় দিয়ে নিজেকে কুফরীর ভিতর ডুবিয়ে রেখে অন্তরে ঘৃণা করলে নিশ্চয় পার পাওয়া যাবে না। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَأَنَعَ

শীঘ্রই কিছু নেতা হবে যাদের কিছু কাজ ভাল হবে কিছু কাজ খারাপ হবে অতএব যে খারাপকে খারাপ হিসাবে চিনতে পারবে সে মুক্তি পাবে যে সেসবের বিরুদ্ধে কথা বলবে সে মুক্তি পাবে কিন্তু যে সন্তুষ্ট চিণ্ডে মেনে নেবে বা অনুসরণ করবে সে ধ্বংস হবে (মুসলিম)

সুতরাং গণতন্ত্রের জয়জয়াকারের এই যুগে কেবল সেই মুসলিমই মুক্তি পাচ্ছে যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার প্রসারে নিজেকে নিয়োগ করেছে। সে যোগ্যতা যার নেই সে অন্তত নিজেকে গণতন্ত্র ও এর যাবতীয় কাজকর্ম থেকে দূরে রাখলেও মুক্তি পাবে। কিন্তু যারা এর স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে মুখে

(৪৪) বুখারী ও মুসলিম

(৪৫) তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনে মাযা, নাসায়ী, রিয়াদুসসালিহীন আলবানী সহীহ বলেছেন

বা অন্তরে বলেন আমরা এটাকে কুফরীই মনে করি তাদের অবস্থা এক ব্যক্তির মত যাকে এক আনাড়ি ডাক্তার বলে দিল আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে পাগল হয়ে যাবেন। ডাক্তারের এমন কথা শুনে যতটুকু চিন্তা হওয়ার কথা উক্ত ব্যক্তির কিন্তু তারচে অনেক বেশি চিন্তা হল কারন তিনি ডাক্তারের উপর অনেক বেশি আস্থা রেখেছিলেন। বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীকে সব কিছু বললে তার স্ত্রীও ভীষন উদ্ভিগ্ন হয়ে সান্তনা দেওয়ার ভাষা পর্যন্ত ভুলে গেল। শেষে লোকটি নিজের সান্তনা নিজেই দিয়ে বললেন,

- ডাক্তারের সব কথা কি আর ঠিক হয়! দেখো আমি ঠিকই সুস্থ থাকব।

এ কথায় তার স্ত্রী যতটুকুই শান্তনা পেয়ে থাকুক তার মন কিন্তু মোটেও শান্তি পেল না। দিন রাত কেবল পাগল হয়ে যাওয়ার ভয়ে আতংকিত সময় কাটাতে লাগল। কাউকে দেখলেই কেবল বলত,

- ডাক্তার কেমন বোকা দেখেছেন! বলে কিনা আমি পাগল হয়ে যাব। আমি সুস্থ মানুষ পাগল হতে যাব কেন?

একসপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন লোকটির মনে হল সে পুরোপুরি সুস্থ আছে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বের হয়ে পরনের লুঙ্গি খুলে হাতে নিয়ে মাথার উপর ঘুরাতে ঘুরাতে রাস্তার উপর দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগল

- আমি পাগল হয় নি, আমি পাগল হয়নি

পাগল না হওয়ার কারনে এই ব্যক্তি যতই খুশি হক আর যতবার কসম করেই অস্বীকার করুক সে যে এখন একজন বদ্ধ উম্মাদ সে বিষয়ে কেবল তার সমপর্যায়ের কেউই সন্দেহ করবে।

যারা গনতন্ত্রের শিক্ষা দিষ্কার আনুগত্য অনুসরনের পরও দাবি করেন আমরা গণতন্ত্রকে কুফরি মনে করি তাদের বলি মলমুত্রের গর্ভে স্বেচ্ছায় ঝাপিয়ে পড়ার পর আবার নাকে কাপড় দেওয়ার কি দরকার?

<# অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কেবল বাহ্যিকভাবে কুফরীকে মেনে নিলেও ঈমান ভঙ্গ হয়। #>

এরা যে কেবল অপরাধী তাই নই বরং কুফরী ব্যাবস্থাকে মুখে ও কাজে স্বীকার করে নেওয়ার কারনে এদের ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে। কারন কুফরী ব্যাবস্থা অন্তরে না মানলেও কেবল মুখে বা কাজে স্বীকার করার মাধ্যমেও ঈমান ভঙ্গ হয়।

আল্লাহ বলেন ,

قُلْ أَلِلّٰهُ وَأَيَّاتِهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة/ ٦٥, ٦٦]

বলুন তোমরা কি আল্লাহ , রসুল ও কিতাবের আয়াত নিয়ে তামাশা করছিলে তোমরা ওয়র দেখিও না তোমরা তো ইমান আনয়নের পর কাফির হয়ে গিয়েছো।

(তাওবা-৬৫,৬৬)

الْهَازِلُ ، أَوْ الْمُسْتَهْزِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكُفْرٍ اسْتِخْفَافًا وَاسْتِهْزَاءً وَمَزَاحًا يَكُونُ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُهُ حِلَافَ ذَلِكَ

যদি কেউ তামাশার ছলে কুফরী কথা মুখ দিয়ে বের করে তবে সকলের মতেই সে কাফির হবে যদিও তার আকীদা ঠিক থাকে।

(ফাতওয়ায়ে আলমগীরী)

من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقد

যে কেউ কুফরী কথা তামাশার ছলে মুখ দিয়ে বের করে সে মুরতাদ হয়ে যায় যদিও সে উক্ত কথা বিশ্বাস করে না।

(আদ- দুররুল মুখতার)

মুল্লা আলী কারী ফিকহে আকবারের শরাহতে বলেন,

ولو تلفظ بالكفر طائعا غير معتقد له يكفر

যদি কেউ স্বেচ্ছায় কুফরী কথা মুখ দ্বারা বের করে তবে সে কাফির হয়ে যায় যদিও সে তা বিশ্বাস না করে।

(শারহে ফিকহে আকবার)

সুতরাং আমরা আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, গণতন্ত্রকে যদি সত্যিই কুফরী ব্যবস্থা মনে করেন তবে এটাকে খোলোস হিসাবে ব্যবহার করাও যে, কুফরী তা ভুলে যাবেন না। এও ভুলে যাবেন না যে, মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে সঠিক পন্থায় কাজ করে যাওয়া। যারা মনে করেন যেকোন পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে কবরে গেলে জাহান্নামী হতে হবে তারা ভুল চিন্তা করছেন। আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী পন্থায় চেষ্টা চালিয়ে যাব যদি মাঝ পথেও কাফির শক্তি আমাদের থামিয়ে দেয় তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের পুরো পুরস্কারই দেবেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এতটাই ব্যাকুল যে কাফিরদের প্রস্তাবিত গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা শেয়ালের বুদ্ধিতে মুরগী বাচানোর চেষ্টা করছেন। তারা শয়তানের ধোকা পড়েছেন। তারা কি বলবেন ইব্রাহীম (عليه السلام) বেশি সম্মানিত নাকি সুলাইমান (عليه السلام)? আশা করি তারা উত্তরটি জানেন। ইব্রাহীম (عليه السلام) কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যাননি আর সুলাইমান (عليه السلام) কে দেওয়া হয়েছিল জিন ও মানুষের রাজত্ব। কিন্তু আল্লাহ ইব্রাহীম (عليه السلام) কে খলীল বলে সম্মোদন করেছেন। ছোট হোক আর বড় হোক যে কোন চেষ্টা আল্লাহর দেখানো পথে হলে তিনি তার পুরস্কার দেন তিনি কেবল দেখেন কাজটি তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়েছে কিনা তার দেখানো পন্থায় হয়েছে কিনা। আর আমরা দেখি দুনিয়াতে কে বেশি

সম্পদ পেয়েছে কে বেশি সফলতা পেয়েছে ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে ওয়ু ছাড়া হাজার রাকাত সলাত পড়লেও সেটা অকারন। তাতে বরং কিছু পাপই হবে^(৯০) কারণ তা সঠিক পন্থায় হয়নি। যারা গনতান্ত্রিক পন্থায় অর্থ ও সময় ব্যয় করছেন তারা দো জাহানের অশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন আর যারা জিহাদ কিতালের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন তারা নিহত হলেও সফল। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ (৫) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ [মুম্ম/ ৫-৬]

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের আমলকে তিনি নষ্ট করবেন না। তিনি অবশ্যই তাদের লক্ষ্যে (জান্নাত) পৌঁছে দেবেন তাদের সমস্যা নিরসন করবেন তাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তাদের পূর্বেই দিয়েছেন (মুহাম্মদ ৪-৬)

আপনারা কি এই মহাপুরস্কার হতেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? কুফরী গনতন্ত্রে আকর্ষণ নিমগ্ন থেকে জাহান্নামকে ক্রয় করে নিচ্ছেন? আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

<# বেশিরভাগ লোকের ভোটে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাটা বাস্তব সম্মতও নয় #>

এ ধরনের তোশামুদে ইসলামী আন্দোলন বাস্তব সম্মতও নই কারণ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف/ ১০৩]

হে নবী তুমি চাইলেও বেশিরভাগ লোক মুমিন হবে না। (সূরা ইউসুফ - ১০৩)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ [هود/ ১৭] [الرعد/ ১] [غافر/ ৫৭]

বেশিরভাগ লোক মুমিন হবে না (সূরা হুদ/১৭ সূরা রদ ১/সূরা মুমিন ৫৯)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [الأعراف/ ১৮৭]

বেশিরভাগ লোক অজ্ঞ (আরাফ ১৮৭ এবং অন্য ১০টি আয়াতে)

فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا [الفرقان/ ৫০]

বেশিরভাগ মানুষ কুফরীকেই পছন্দ করে (ফুরকান ৫০/বনীইসরাইল ৮৯)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ [البقرة/ ২৪৩] [يوسف/ ৩৮] [غافر/ ৬১]

বেশিরভাগ মানুষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে না (বকারা ২৪৩/ইউসুফ ৩৮/মুমিন ৬১)

(৯০) ইমাম আবু হানীফার মতে সে কাফির হয়ে যাবে।

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ [الأَنْعَام/ ١١٦]

যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশের ইচ্ছানুযায়ী চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা হতে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমান করে চলে। (আনআম/১১৬)

বেশিরভাগ লোককে ইসলাম পন্থি বানানো যাবে না কারন শিরক কুফর ও পাপ কাজের প্রতি মানুষের সহজাত ঝোক বিদ্যমান আর একারণেও যে, ইবলিস তার অশ্বারহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে আদম সন্তানের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছে। মানুষের মধ্য তার বহুসংখ্যক বন্ধু ও শাগরেদ রয়েছে যারা তার তত্ত্ব মত্ব ফুকে মানুষের অন্তরকে কলুষিত করতে সদা তৎপর। বিভিন্ন “এন,জি,ও” র সেচ্ছাসেবী কর্মীরা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দিচ্ছে। যদি মুসলিমরা শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মন জয়ের চেষ্টা করতে থাকে তবে ইবলিসের এক তেলসমাতিতেই সব চেষ্টা ভেঙে চলে যাবে। তাই মানুষকে শুধু ইসলামের দিকে ডাকলেই হবে না যে সব শয়তানী চক্রান্ত তাদের ভুলিয়ে রেখেছে শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলো বিনষ্ট করতে হবে। যারা এটা বোঝেননা তারাই কেবল ষড়যন্ত্রকারী কাফিরদের ধোঁকায় বোকা বনে বেশিরভাগ লোকের ভোট আদায়ের জন্য মাঠে নেমে গেছেন।

মস্তবড় পীরের বিশ্বস্ত একজন মুরিদ একবার পীর সাহেবকে বলল,

- হুজুর, শুনেছি আপনি জিন বশ করেন, জিনদের দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নেন আমার সাথে একদিন একটা জিন পাঠান যাতে আমার বাড়ির কাজগুলো করে দেয়।

পীর সাহেব মমতা মাখা কণ্ঠে বলেন,

- জিন তো পাঠাব, কিন্তু কাজ দিতে না পারলে জীবন থাকবে না।

মুরিদ সহাস্যে বলে,

- আমার দুই স্ত্রী আর সাত মেয়ে সারা দিনে যে কাজ শেষ করতে পারেনা আমি জিন দিয়ে সেই কাজই করাব।

বাড়ি ফিরে কিন্তু ভিন্ন অভিজ্ঞতা হল জিনের জন্য যত কাজ জড়ো করা হয়েছিল নিমিষে সেগুলো শেষ করে জিন এবার মুরিদের উপর চড়াও হল। বেচারার প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত তখন তার বুদ্ধিমতি মেয়ে বাড়ি পাহাড়া দেওয়ার কুকুরটির দিকে ইশারা করে বলে,

- ওহে জিন এই কুকুরটির লেজ সোজা করো দেখি।

সাথে সাথেই জিনটি কুকুরটিকে পাকড়াও করে তার লেজ ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। কিন্তু যত বারই লেজটি ছেড়ে দেয় পুরোপুরি আবার ধনুকের মত বাকা হয়ে যায়। এভাবে জিনটিকে অসাধ্য সাধনে ব্যাস্ত দেখে মুরিদের অশান্ত হৃদয় প্রশান্ত হল।

এসকল হযরতগনের অবস্থাও কিছুমাত্র ব্যাতিক্রম নই। সাদা চামড়ার প্রভুদের নরম কথায় চরমভাবে

প্রভাবিত হয়ে এনারা নেমেছেন জনসমর্থন আদায়ের কঠিন লড়ায়ে। কিন্তু জনসাধারণ কুকুরের লেজের চেয়ে অনেক বেশি একগুয়ে। বিরতিহীন ওয়াজ নসীহত আর বিভিন্ন কৌশল কসরত করে কিছু লোক দলে ভিড়াতে পেরেছেন ঠিকই কিন্তু তাতে মাঠ জমেনা। আল্লাহ তার রসুল (ﷺ) কে বলেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف/ ১০৩]

হে নবী তুমি চাইলেও বেশিরভাগ লোক মুমিন হবে না। (সূরা ইউসুফ - ১০৩)

রসুলুল্লাহর দাওয়াতেও যদি বেশিরভাগ লোক সাড়া না দেয় তবে এসকল বুদ্ধি বিবর্জীত হযরতগন কেন মনে করলেন যে, বেশিরভাগ লোককে বাগে আনতে তারা সক্ষম হবেন? তাদের দাওয়াতি কলাকৌশল ও যোগ্যতা কি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়েও অধিক (নাউযু বিল্লা) যদি তেমনটি মনে না করেন এবং এই আয়াতের উপর বিশ্বাসে কোন ত্রুটি না থাকে তবে এখনও সময় আছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার। তা না হলে কুকুরের লেজ সোজা করতে করতে জীবন পাত হয়ে যাবে। না দুনিয়াতে কোন ফলাফল পাওয়া যাবে আর না আল্লাহর নিকট কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে।

একটা অসম্ভব বিষয় কল্পনা করুন। ধরুন বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে ইসলাম পন্থীরা ক্ষমতায় আহরন করল। এখন কি হবে?

পুরা রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান চালু করা হবে, চোরকে হাত কেটে দেওয়া হবে বিবাহিত জেনাকারী ছেলে ও মেয়েকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে, মেয়েদের উপর পর্দা বাধ্যতামূলক করা হবে। এর পর সেই গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর আন্তর্জাতিক চাপ শুরু হবে। আমেরিকা বলবে রজম, দোরা মানবতা বিরোধী, হাত কাটা আইন বর্বর যারা অদ্যকার দিনে এসব মধ্যযুগীয় আইন চালু করছে তাদের ক্ষমতা হতে হটাও।

আপনার কি মনে হয়, দেশের সেনা বাহিনী কার কথা শুনবে? নির্বাচিত নব ইসলামী সরকারের নাকি আমেরিকার? আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারছেন আমেরিকার নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে মুহর্তকাল অপেক্ষা না করে সেনাবাহিনী সদ্য নির্বাচিত ইসলামী সাংসদদের বংশ পর্যন্ত নির্মূল করে ছাড়বে আর তখন এসকল হযরতদের চরম খেসারত দিতে হবে।

কেন এমন হবে?

কারণ এনারা কৈ এর তেলে কৈ ভাজতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী গনতন্ত্রের প্রস্তুতাবকেরা যেমন আমেরিকার প্রভাবে গনতান্ত্রিক হয়েছেন তেমনি এ সেনাবাহিনীও আমেরিকান দর্শনে দিক্ষীত। এদের অফিসাররা উচ্চ ট্রেইনিং এর জন্য আমেরিকা ভ্রমণ করে, সেনাবাহিনীতে ঢোকার পর হতেই এদের যাবতীয় প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি পাশ্চাত্য স্টাইলেই সম্পাদিত হয়। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আর কৃষ্টি কালচারে এদের মন মগজ আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। একটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সর্বদা এই দিক্ষায় দিক্ষিত যে, জনগন যে সরকারই নির্বাচিত করবে আমরা তারই আনুগত্য করব যদিও সে ইসলাম বিরোধী

হয়। এই যার আকীদা সে কাফির না মুসলিম? কোনো সন্দেহ নেই যে তারা কাফির।

আপনারা একদল কাফিরের উপর ভরসা করে কুফরী সিস্টেমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। কাফিররা আপনাদের জন্য দুটি অপ্রিতিকর বস্তু প্রস্তুত রেখেছে,

১. আপনাদের অসাধ্য সাধনে ব্যাস্ত রেখেছে। বিভিন্ন স্থানে ছোট্ট ছুটি লাফালাফি করে আপনাদের ভোট সংগ্রহ করতে দেখে ইসলামের শত্রুরা কিন্তু মোটেও সঙ্কিত নই। তারা ভাল করেই জানে আপনারা কোন মরুভূমিতে পানি খুজে বেড়াচ্ছেন। হাতড়িয়ে মাছ খোজার জন্য আপনাদের পুকুরে ব্যাস্ত রেখে তারা তৃপ্তির হাসি হাসছে।

২. যদি কখনও কোন দিন এই অসম্ভবও সম্ভব হয় তবে সেদিন আপনাদেরই এসব সম্মানিত শিক্ষাগুরুরা আপনাদের এক মহামূল্যবান বানী শিক্ষা দেবেন তা এই যে, কখনও শত্রুর উপর ভরসা করো না কিছু করতে চাইলে নিজ চেষ্টায় করো। এ শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে আত্মস্ত করতে হলে একটা শিক্ষণীয় গল্প শুনতে হবে।

একজন অত্যাচারী জামিদার কঠোর শর্তে গরীব চাষীদের নিকট জমি বর্গা দিতেন। বিঘা প্রতি ৫ মনের কম ধান হলে চাষীকে কিছুই দেওয়া হত না বলা হত তুমি কর্মে ফাকি দিয়েছো তাই তো ধান কম হয়েছে। তার মুখের উপর কথা বলার সাহসও হতনা কোন চাষীর কথা বললেই পেয়াদা দিয়ে পেটানো হত। একবার এক চাষী খুব সাহস করে বলে

- হুজুর আমি তো খুব খাটুনি করেছি তবু ধান কম হয়েছে এতে আমার কি দোষ?

পেয়াদারা বলে ,

- তাড়াতাড়ি ভাগ! তা না হলে কিন্তু লাঠিপেটা করব।

চাষি বলে,

- এমন অন্যায় করবেন না হুজুর।

একথা শুনে তো পেয়াদাদের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। চাষীকে নিশ্চয় ভীষন শাস্তি দেওয়া হত কিন্তু তার হাড় চামড়ার শরীরে মারার মত জায়গা ছিলনা বলেই রক্ষে। ওভাবে কাকুতি মিনতি করতে দেখে জমিদার বলে ,

- আমার বড় পুকুর থেকে হাত দিয়ে হাতড়িয়ে একটা মাগুড় মাছ ধরে আনতে পারলে তোকে পুরো পাচ মন ধানই দেব। যা চেষ্টা করে দেখ পারিস কি না।

চাষী আর দেরি না করে তখনি পুকুরে নেমে গেল। পুকুরের এপার হতে ওপার ছুটাছুটি করতে লাগল। এ কান্ড দেখে জমিদারের পেয়াদারা হা হা করে হাসতে লাগল। অনেক চেষ্টা করে চাষী কিন্তু সত্যি সত্যিই একটা মাছ ধরে ফেলল। মাছ দেখে কিন্তু জমিদার মোটেও খুশি হল না। ভীষন রেগে চিৎকার করে বলল

- এই কে আছিস ওকে ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দে

পেয়াদারা চাষীকে যে শিক্ষা দিয়েছিল এসকল গনতান্ত্রিক হুজুরদেরও ঐধরনের শিক্ষাই দেওয়া হবে।
এরা মনে করেন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেলেই কাফিররা তাদের ওপর ভীষন খুশি হয়ে বলবে,

- আসুন হুজুর এই চেয়ারটিতে বসে আপনার যা ইচ্ছা ফতওয়া দিন আমরা তা রাষ্ট্রে চালু করব।

এ ধরনের ধারণা এদের স্বল্প জ্ঞানের পরিচয় বহন করে মাত্র। জমিদার যেমন চাষীর হাতে মাছ দেখে পূর্বাপেক্ষা বেশি রেগে গিয়েছিল। যদি সত্যি সত্যিই ইসলাম পন্থিরা বেশি ভোট পেয়ে যান তবে ইসলামের শত্রু গনতন্ত্রের প্রবর্তকেরা রাগ আর গোম্মার বশবর্তি হয়ে অগনতান্ত্রিক ভাবেই সেদিন এসকল হুজুরদের বিতাড়িত করবেন। ক্ষমতার মসনদে বসার সুযোগ এদের দেওয়া হবে না। যদি দেওয়া হয়ও তা শর্ত সাপেক্ষেই দেওয়া হবে যেমন ধরুন ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান চলবে না, চোরের হাত কাটা যাবে না মেয়েদের পর্দার অঙ্ককারে রাখা যাবে না। নারী পুরুষ স্বেচ্ছায় জিনা ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে সেটা মেনে নিতে হবে ইত্যাদি। আমরা নিশ্চিত যে ইসলামী গনতন্ত্রের প্রবর্তকরা ক্ষমতার লোভে সেদিন এধরনের শর্তে রাজী হবে। তখন তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলবে,

- আপনাদের সৌভাগ্য যে, টুপি ওয়ালা মন্ত্রি আর দাড়ি ওয়ালা প্রেসিডেন্ট দেখতে পাচ্ছেন এরচে বেশি আর কি চান! গনতন্ত্রের মাধ্যমে এ ছাড়া আর কিই বা করা সম্ভব।

<# গণতন্ত্রের বিকল্প #>

গনতন্ত্রের মাধ্যমে এরচে বেশি কিছু যে করা যায় না তা আমরা জানি। তাই তো আপনাদের বলি যদি সত্যিই ইসলামী রাষ্ট্র চান তবে এখনও হেয়ালী ছেড়ে ইসলামী পথ ধরুন। কাফের সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর না করে তাওহীদের সেনা গঠন করুন। ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে শক্তি সংগ্রহ করুন। আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال/১০]

কাফিরদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে সাধ্যমত শক্তি এবং যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত ঘোড়া সংগ্রহ করো যাতে করে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের সন্ত্রস্ত করতে পারো (আলআনফাল/৬০)

এই আয়াতে শক্তি বলতে কি বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

শুনে নাও শক্তি হল অস্ত্র নিক্ষেপ করা শুনে নাও শক্তি হল অস্ত্র নিক্ষেপ করা শুনে নাও শক্তি হল অস্ত্র নিক্ষেপ করা (মুসলিম)

আমরা জানি এসমস্ত তৃণভোজী হুজুররা অস্ত্রকে ঘৃণা করেন। এরা গৌতম বুদ্ধের পরমত সহিষ্ণুতা আর

গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। কোন বস্তু ঘণিত আর কোনটি গৃহিত এরা সেটা ঠিক করেন সমাজ দিয়ে, কোরআন দিয়ে নয়। অথচ রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي ومنبله

নিশ্চয় আল্লাহ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে এটা তৈরী করে এবং উত্তম নিয়ত করে, যে এটা সরবরাহ করে, এবং যে এটা নিক্ষেপ করে। (আবু দুউদ, নসায়ী)

من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ فيعدل رقية

যে কেউ শত্রুর উদ্দেশ্যে তীর ছোড়ে তার তীর শত্রু পর্যন্ত পৌছায় তবে কারও শরীরে বিদ্ধ হক বা না হক তাকে একটি দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব দেওয়া হয়

(ইবনে মাযা)

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

যে কেউ তীর চালানো শেখার পর তা ভুলে যায় সে আমাদের কেউ না অথবা বলেছেন সে পাপ করল।
(মুসলিম)

بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي

আমাকে তরবারী দিয়ে পাঠানো হয়েছে যতক্ষণ না লা শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় আর আমার রিয়িক রাখা হয়েছে বর্ষার নিচে।⁽⁹¹⁾

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

জেনে রাখো জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে⁽⁹²⁾

من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي

পিতার উপর সন্তানের হক এই যে, পিতা তাকে আল্লাহর কিতাব, সাতার ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা দেবে
(আহকামুল কুরআন জাসসাস, বায়হাকী)

ইমাম আল কুরতুবী বলেন,

(91) মুসনাদে আহমদ শুআইব আলআরনাউত এবং আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন (সিলসিলাতু আদদাইফা ১৬৯৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য) কিন্তু ইরওয়উল গালীলে আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন আর মুলভাব পূর্বের হাদীসটির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লাহই ভাল জানেন।

(92) বুখারী ও মুসলিম

ঘোড়া ও অস্ত্র চালানো শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া (তাফসীরে কুরতুবী)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِنَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً [النساء/ ১০২]

কাফিররা চায় যে, তোমরা অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামাদী সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ো যাতে একটি বার হলেও তারা তোমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করতে পারে (নিসা ১০২)

<# ইসলাম কায়েমের সঠিক পদ্ধতি #>

যারা অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে মুসলিমদের নিরস্ত্র করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন তারা কাফিরদের ইচ্ছাই পূরা করতে চাচ্ছেন আর সুরা আনফালে আল্লাহ যে, শক্তি সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন তারা তা অমান্য করছেন। জিহাদ পরিত্যাগ করে যারা গনতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম কায়েমের স্বপ্নে বিভোর তারা এই অপরাধে অপরাধী। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

যখন তোমরা সুদী বেচাকেনা করবে গরুর লেজ ও ক্ষেত খামার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে (দুনিয়ার প্রতি ঝুকে যাবে) এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে সেসময় আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান ও লাঞ্ছনা লিখে দেবেন তা শেষ হবে না যতক্ষণ না তোমরা আবার দ্বীনে ফিরে আসো।⁽⁹³⁾

সুতরাং জিহাদ আল্লাহর দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বরং এই দ্বীনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ⁽⁹⁴⁾ যারা এটাকে বাদ দিয়ে ইসলামী আন্দোলন করেন তারা সকলে আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছেন তারা কুফরী পন্থায় যতই চেষ্টা তদবীর করেন তা অমূলক ও অকারন হবে তারা কেবলই অপমানিত হতে থাকবেন যতক্ষণ না তারা আবার কুফর শিরকের বিরুদ্ধে সসস্ত্র জিহাদ কিতালের পথে ফিরে আসেন।

গনতান্ত্রিক ইসলামের একজন সাধু ব্যক্তি খুবই অবাক হয়ে বলেছেন,

- আপনারা যদি গনতান্ত্রিক পন্থাকে অস্বীকারই করেন তবে কোন্ পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করবেন?

প্রশ্ন শুনে মনে হয় এযাবত কাল মুসলিমরা কখনও কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেনি সে সুযোগও

(93) আবু দাউদ, আলবানী সহীহ বলেছেন সিলসিলাতুস সাহীহা ১১ নং হাদীস

(94) রসুলুল্লাহ (ﷺ) জিহাদকে এ দিনের সর্বচ্চ শৃঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে মাযা, রিয়াদুসসালাহীন আলবানী সহী বলেছেন সিলসিলাতুস সাহীহা ১১২২ নং হাদীস।

তাদের হয়নি। মুসলিমদের এই দুঃখ দুর্দশা নিরসন কল্পেই ইসলামের শত্রুরা গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে। গণতন্ত্রের আবির্ভাবের পরই কেবল মাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মাড়ায়ের সময় গরু যেভাবে শস্যের উপর ঘুরপাক খায় এসকল পন্ডিতরা গণতন্ত্রের পচা ডোবায় সেভাবে ঘুরপাক খেয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। যারা আজন্ম এই কুফরী ব্যবস্থার মধ্যে নিমগ্ন রয়েছেন ইসলাম কায়েমের সঠিক পদ্ধতি তাদের জানার কথা নই। মশা কিভাবে জানবে রক্ত ছাড়া অন্য কিছু খেয়ে কোন প্রানী বাচতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف/ ১০৩]

হে নবী তুমি চাইলেও বেশিরভাগ লোক মুমিন হবে না। (সূরা ইউসুফ - ১০৩)

সুতরাং ইসলাম কায়েমের জন্য এমন একটি পথই যুক্তি যুক্ত যার মাধ্যমে মুমিনদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও বেশি সংখ্যক কাফিরদের উপর বিজয়ী হওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল বাস্তবে কি এমন পন্থা পদ্ধতি বিদ্যমান আছে? আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة/ ২৪৭]

যখন তালুত এবং তার সাথে যেসব মুমিনরা ছিল তারা নদী পার হল তখন তারা বলল আজ আমরা জালুত এবং তার সেনা বহিনীর মুকাবেলায় দাড়াতেই পারব না। যারা আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে তারা বলল কত ছোট দল আল্লাহর ইচ্ছায় কত বড় দলকে পরাজীত করেছে! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। (বাকারা ২৪৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে শক্তি ও সংখ্যায় কাফিরদের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও বহুবারই মুমিনরা আল্লাহর ইচ্ছায় কাফিরদের উপর বিজয় অর্জন করেছে কিন্তু কি সেই পন্থা যা তারা অবলম্বন করেছিল? আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [آل عمران/ ১২৩]

আল্লাহ তোমাদের বদরের ময়দানে বিজয় দিয়েছেন অথচ তোমরা শক্তি ও সংখ্যায় নগন্য ছিলে অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং কৃতজ্ঞ হও। (আলে ইমরান ১২৩)

এতক্ষনে বিষয়টি খোলোসা হল। স্পষ্টতই বোঝা গেল আসলে মুমিনরা যুদ্ধের ময়দানে সংখ্যা ও শক্তিতে নগন্য হলেও কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। এ বিজয় আল্লাহর ওয়াদা। সুতরাং যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হয় তবে বদরের ময়দানে কাফিরদের মুকাবিলা করতে হবে ব্যালটের ময়দানে নই। যে পন্থায় চেষ্টা করলে আল্লাহ বিজয়ের ওয়াদা করেছেন তা ছেড়ে কুফরী পন্থা অবলম্বন করলে জীবন ও

মৃত্যুতে আল্লাহর অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। যেমনটি ঘটেছিল মুসা (عليه السلام) এর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যখন তিনি তাদের বললেন,

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ [المائدة/ ٢١]

হে আমার সম্প্রদায় তোমরা এই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো (তার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে তা দখল করে নাও) আর তোমরা (শত্রুর ভয়ে) পিছপা ,হয়োনো তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে (মায়েদা ২১) তারা বলল,

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ [المائدة/ ২২]

হে মুসা ওখানে তো খুবই শক্তিশালী সম্প্রদায় বসবাস করছে (অর্থাৎ তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করে পারব না) তারা যতক্ষণ থাকে আমরা ওখানে প্রবেশ করব না যদি তারা বের হয়ে যায় তবে আমরা প্রবেশ করতে পারি।

বনী ইসরাইলের এহেনো কাপুরুষতায় হতবাক হয়ে ইউশা ইবন নুন এবং কালিব বললেন।

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة/ ২৩]

তারা উপস্থিত থাকতেই তোমরা শুধু ভিতরে প্রবেশ করো তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে। তোমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করো যদি মুমিন হয়ে থাকো।

(মায়েদা ২৩)

কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে ভীত কাপুরুষরা বলল,

يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ [المائدة/ ২৪]

হে মুসা তারা যতক্ষণ ওখানে বিদ্যমান থাকবে আমরা ও এলাকাতে প্রবেশ করব না বরং তুমি আর তোমার রব যাও যুদ্ধ করো আমরা এখানে বসেই থাকব।

(মায়েদা ২৪)

তাদের এই অবাধ্যতায় রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ বললেন,

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ [المائدة/ ২৬]

এই এলাকা তাদের জন্য ৪০ বছর নিষিদ্ধ থাকবে তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াবে (কোন বাসস্থান পাবে না) অতএব তুমি এসকল অবাধ্যদের ব্যাপারে চিন্তিত হও না। (মায়েদা ২৬)

যারা মনে করেন কাফিরদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে না জড়িয়ে নিরাপদে সারাটা জীবন দাওয়াত আর তারবিয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন পরে যেদিন আল্লাহ ফেরেশ্তা পাঠিয়ে কাফিরদের ধ্বংস সাধন করবেন সেদিন সাহসা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে তাদের জন্য এই ঘটনাতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সাহায্য তো আল্লাহই করবেন কিন্তু মুমিনদের যা আছে তাই নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাফিরদের সামনে বুক টান করে দাড়িয়ে যেতে হবে এবং ময়দানে টিকে থাকতে হবে তবেই সাহায্য আসবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ (١٢٤) بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ [آل عمران/ ১২৪, ১২৫]

যখন আপনি মুমিনদের বলছিলেন তোমাদের কি যথেষ্ট হবে না যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশ্তা অবতরন করবেন হ্যাঁ এবং সেই একই সময়ই মুশরিকরাও আসবে। তোমাদের রব তোমাদের চিহ্নিত পাচ হাজার ফেরেশ্তা একের পর এক নাযিল করার মাধ্যমে সাহায্য করবেন যদি তোমরা ময়দানে টিকে থাকো (৯৫) এবং আল্লাহকে ভয় করো। (আলে ইমরান ১২৪, ১২৫)

আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয় আসবে কিন্তু তার জন্য শর্ত হল যতটুকু সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করে ময়দান পর্যন্ত পৌছাতে হবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবেনা এমন মনে করাও বোকামী হবে যে, আল্লাহ ও তার ফেরেশ্তারাই সব কর্ম শেষ করে দেবেন আল্লাহ চাইলে তা করতে পারেন কিন্তু তিনি চান মুমিনদের হাতে কাফিরদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরকে প্রশান্ত করতে, মুমিনদের মধ্যে মুনাফিক কারা তা প্রকাশ করে দিতে এবং মুমিনদের এক দলকে শাহাদতের সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করতে। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمُ [التوبة/ ১৪]

তাদের সাথে যুদ্ধ করো আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন (তাওবা /১৪)

উভ্দের যুদ্ধে আপাত পরাজীত হওয়ার কারনে সহাবারা যখন ভীষন দুঃচিন্তার ভিতরে ছিলেন আল্লাহ তখন শান্তনা হিসাবে নাযিল করেন ,

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ [آل عمران/ ১৪০]

(৯৫) (علي لقلوبعدا) অর্থাৎ শত্রুর মোকাবিলায় টিকে থাকা

যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাকো তো এর পূর্বে তো তারাও আঘাত পেয়েছে এভাবে আমি জয় পরাজয় কখনও কাফিরদের আর কখনও মুসলিমদের দিতে থাকব (৭৬) যাতে কে প্রকৃতই মুমিন তা প্রকাশ হয়ে পড়ে আর আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তিকে শহীদ হিসাবে কবুল করতে পারেন।

(আলে ইমরান - ১৪০)

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ [محمد/৪]

আল্লাহ চাইলে নিজেই কাফিরদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহন করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের একদলের (কাফিরদের) মাধ্যমে অন্য দলকে (মুমিনদের) পরীক্ষা করেন।

(মুহাম্মদ - ৪)

যারা মনে করছেন কাফিরদের দেওয়া শর্ত ও তাদের মতবাদ মেনে চললেই তারা খুশি হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে তারাও ভীষন ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছেন। আমরা এদের স্পষ্ট বলে দিতে চাই কাফিরদের পন্থা পদ্ধতি মেনে নিয়ে তাদের সম্ভ্রষ্ট অর্জন করে নই বরং কাফিরদের গর্দানে আঘাত করেই ইসলাম কায়েম করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنتَحَسْتُمُوهُمْ [محمد/৪]

যখনই কাফিরদের সাথে তোমাদের মোকবিলা হয় তাদের গর্দানে আঘাত করো যতক্ষণ না পৃথিবীতে রক্ত বন্যা বয়ে যায়।

(মুহাম্মদ-৪)

যারা কাফিরদের সম্ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছেন তারা ভুল করছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنَّ آتِيعَتَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ [البقرة/ ১২০]

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা তোমার উপর কখনই সম্ভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের মত মেনে চলো আল্লাহ তোমাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলো তবে কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী তোমাকে আল্লাহর ক্রোধ হতে রক্ষা করতে পারবে না (বাকারা - ১২০)

সুতরাং যারা কাফিরদের কুফরী গণতন্ত্র মেনে নিয়েছেন তাদের উপর কাফিররা সম্ভ্রষ্ট হবে ঠিকই কিন্তু এ

(৭৬) জালালাইনে বলা হয়েছে (مَوِيذَةً مَلْفُوفَةً مَوِيذَةً مَوِيذَةً) বিজয় একদিন একদলের অন্য দিন ভিন্ন দলের হবে। আলবায়দাবিতেও অনুরূপই আছে আততাবারী বলেন (وَيَعْنِي بِسَالِذَا يَهْلَسِلَا بَيْنَ كَرَشِلَاو) এই আয়াতে মুসলিম ও মুশরিকদের উদ্দেশ্য)

পন্থায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না এ পন্থায় ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করলেও তা গ্রহনযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران/ ১০]

যে কেউই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদের অনুসরণ করে তার নিকট হতে তা গ্রহন করা হবে না আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে (আলে ইমরান - ৮৫)

তারা বলে,

- বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়ে আপনারা তো অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। সসস্ত্র জিহাদ করে আপনারা কি করতে পেরেছেন?

যদি কেউ আল্লাহর দেওয়া পন্থায় আল্লাহর দিন কায়েমের চেষ্টা করে মৃত্যুবরণ করে তবে সে সফল আর যারা কুফরী পন্থায় কাফিরদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন তাদের আয়ুষ্কাল যদি হাজার বছরও হয় তবু সেটা লাভের অংশ নই। তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ [البقرة/ ৭৬]

তাদের কেউ কেউ তো হাজার বছর বাচতে চায় কিন্তু এটা তাদের আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবে না। (বাকারা - ৯৬)

কুফর শিরকের ভিতর অবস্থান করে হাজার বছর টিকে থেকে কি লাভ! হকের উপর টিকে থেকে ত্বরা মৃত্যুই তো আমাদের জন্য বেশি কল্যানকর। জান্নাতকে যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য দুনিয়াতে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করাও অধিক মনে হয় উমাইর (رضي الله عنه) তো কয়েকটি খেজুর খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাননি। তিনি বলেছিলেন,

لَئِنْ أَنَا حَيِّتٌ حَتَّى أَكُلَ ثَمَرَاتِي هَذِهِ لِحَيَاةٍ طَوِيلَةٍ

যদি আমি এই খেজুর কয়টি খওয়া পর্যন্ত বেচে থাকি তবে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

তখনই তিনি লড়াই শুরু করে দেন এবং শহীদ হয়ে যান। (মুসলিম)

আমাদের বুঝে আসে না কি কারনে আপনারা টিকে থাকাকে গুরুত্ব দেন অথচ নবীদের শিক্ষনীয় কাহিনী আপনাদের সামনে হাজির রয়েছে। যে মরদে মুসলিম হকের উপর টিকে থেকে জীবন দেয় তার রক্তে বহুকাল হক জীবিত থাকে। মানুষ বলে অমুককে অমুক কারনে হত্যা করা হয়েছে। সুরা বুরুজ্জে বর্ণিত আসহাবে উখদুদের ঘটনা লক্ষ করুন। একজন বালক সত্যের জন্য জীবন দেওয়ার কারনে বিপুল সংখক লোক মুসলিম হয়ে গেল। আপনাদের কি মনে হয় যদি বালকটি আপোস করে টিকে থাকার চিন্তা করত তবেই কি আল্লাহর দিনের বেশি উপকার হত? যারা টিকে থাকার জন্য কুফরীর সাথে আপোস করেন

তারা নিজেদের জীবন রক্ষার নিমিত্তে বতিলের সাথে আপোস করে সত্যকে গলাটিপে হত্যা করেন। চিন্তা করুন, এসকল নরাধমদের বেচে থাকার থেকে হকপন্থিদের মৃত্যুই তো ইসলামের জন্য বেশি উপকারী!

যদি বলা হয়,

- সসস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে আপনারা কি করতে পেরেছেন?

এর উত্তরও খুবই সহজ। একজন মুসলিমের জন্য সবচে বড় করণীয় হল আল্লাহর হুকুম পালন করা। আল্লাহ আমাদের উপর যা ফরজ করেছেন আমরা তার দেখানো পন্থায় তা করার চেষ্টা করেছি এটাই আমাদের সবচে বড় কৃতকর্ম। যারা আল্লাহর হুকুম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কুফর শিরকের সাথে আপোস করে বড় কিছু করে দেখাতে চাচ্ছেন তাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ আপনাদের বড় কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। তিনি তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার বিধানের উপর টিকে থেকে যে পরিনতি হয় তা মেনে নেওয়ার জন্য কাফিরদের মত পথ মেনে নিয়ে বড় কিছু করে দেখানোর জন্য নই। সফলতা তো জান্নাত আর ব্যর্থতা হল জাহান্নাম। দুনিয়ার সফলতা দিয়ে বিচার করলে নিশ্চয় প্রতারিত হতে হবে।

অনেক বুয়ুর্গ জিহাদকে ফেতনা ফাসাদ মনে করেন। ফিতনা ফাসাদের অর্থ সম্ভবত তারা কোন বাংলা ডিকশনারী হতে মুখস্ত করে নিয়েছেন। তাদের জ্ঞাতার্থে বলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন

اِتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال/ ৩৭]

তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দিন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

(আনফাল - ৩৯)

তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে বলছেন জিহাদের মাধ্যমে ফিতনা শেষ হয় আর আপনারা বলছে জিহাদে ফিতনা হয় কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে? আসলে ইসলামে ফিতনা অর্থ হল মুমিনদের কষ্ট দিয়ে বা প্রলভন দেখিয়ে আল্লাহর দিন থেকে ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [البُورُج/ ১০]

নিশ্চয় যারা মুমিনদের ফিতনায় ফেলে (তাদের কষ্ট দিয়ে ইসলাম হতে ফিরানোর চেষ্টা করে) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে দগ্ধ যন্ত্রনা (বুরুজ - ১০)

ইবনে উমর (رضي الله عنه) কে সুরা আনফালের ৩৯ নং আয়াতটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يَفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتْلَوْهُ وَإِمَّا يَعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً

ইসলাম তখন দুর্বল ছিল মুমিনদের তাদের দিনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলা হত হয়ত তাকে হত্যা করা হত নতুবা ভীষন শাস্তি দেওয়া হত কিন্তু যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হল তখন আর কোন ফিতনা অবশিষ্ট

একরনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/ ১৭১]

ফিতনা হত্যা অপেক্ষা মারাত্মক (বাকারা ১৯১)

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/ ২১৭]

ফিতনা হত্যা অপেক্ষা বড় পাপ (বাকারা/২১৭)

অর্থাৎ একজন মানুষকেও ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে আল্লাহর রাস্তা হতে ফিরিয়ে রেখে জাহান্নামী করা শত সহস্র মানুষকে হত্যা করার চেয়ে বেশি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহর জমিনে মানুষের আইন দ্বারা বিচার করা, যে কেউ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাকে থামিয়ে দেওয়া, শিরক কুফরে রাষ্ট্র মাতিয়ে ফেলা এতই মারাত্মক অপরাধ যে এ ব্যাবস্থা ধ্বংস করে ইসলামী ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যদি শত মানুষের রক্ত ঝাড়াতে হয় তবে তা কমই হবে কারন ফিতনা হত্যা অপেক্ষা বড় ও জঘন্য অপরাধ। অনেকে এই আয়াতদুটিকেই জিহাদের বিপক্ষে ব্যবহার করে থাকেন তাদের অনুরোধ করব যদি আল্লাহকে ভয় করেন উক্ত আয়াত দুটির আগে ও পরে একটু লক্ষ করুন। সম্ভব হলে একটু কষ্ট করে তাফসীর গ্রন্থ খুলে আয়াত দুটির সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। প্রথম আয়াতটির পুরো অংশ এমন,

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُفَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفَاتِلَوْكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ [البقرة/ ১৭১]

কাফিরদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তারা যেখান হতে তোমাদের বের করে দিয়েছে ওখান থেকে তাদের বের করো **নিশ্চয় ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য** তোমরা তাদের সাথে মসজিদের হারামের নিকট আগে যুদ্ধ করো না যতক্ষন না তারা সেখানে আগে যুদ্ধ শুরু করে যদি তারা যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করো এটাই কাফিরদের শাস্তি। (বাকারা - ১৯১)

এবার একটু চিন্তা করুন তো ফিতনা অর্থ আয়াতে কি হতে পারে। অন্য আয়াতটির আগে এবং পরে যা বলা হয়েছে তা হল,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ

دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨) [البقرة/٢١٧]

[২১৮]

তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তুমি বলে দাও হারাম মাসে যুদ্ধ করা পাপ তবে আল্লাহর রাস্তা হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা আল্লাহর সাথে কুফরী করা মসজিদের হারামের হক নষ্ট করা মসজিদে অবস্থান কারীদের বাহির করে দেওয়া এর চেয়েও বড় পাপ ফিতনা হত্যা অপেক্ষা বড় পাপ। কাফিররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদের দিন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে যদি তারা সক্ষম হয় যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দিন থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরন করে তবে দুনিয়াতে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হবে আর আখিরাতে সে চিরকাল জাহান্নামবাসী হবে। যারা ইমান এনেছে হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর রহমতের আশা করে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (বাকারা ২১৭, ২১৮)

উভয় আয়াতেই কাফিরদের হত্যা করতে বলা হয়েছে এবং জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে কাফিররা ইসলাম থেকে মুসলিমদের ফিরানোর জন্য কি কি কৌশল করে সেগুলো উল্লেখ করে বলা হয়েছে ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য অর্থাৎ ওহে মুসলিমরা তোমরা জিহাদ কিতালের মাধ্যমে কিছু মানুষকে হত্যা করছো আর এটা করছো ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব ফিতনা তা নির্মূলের উদ্দেশ্যে। যদিও হত্যা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয় কিন্তু ফিতনা এর চেয়েও বেশি খারাপ তাই ফিতনা নির্মূলের জন্যই তিনি জিহাদে কাফিরদের হত্যা করা বৈধ করেছেন। এর পরও কি আপনারা আয়াত দুটি জিহাদের বিপক্ষে ব্যবহার করবেন?

একদল লোক জিহাদের না যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে বলল,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي [التوبة/ ৬৭]

আমাকে অনুমতি দিন আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না (তাওবা ৪৯)

আল্লাহ (ﷻ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ [التوبة/ ৬৭]

ওরা তো ফিতনায়ই পড়ে রয়েছে নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদের বেষ্টন করে রয়েছে (তাওবা ৪৯)

আসলে যারা জিহাদ হতে পালাবার জন্য বিভিন্ন পায়তারা করছেন তারা ফিতনাতে পড়ে রয়েছেন কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না।

ফাসাদ (فساد) অর্থ হল নষ্ট হয়ে যাওয়া। যে জিনিসের যে কাজ সেই কাজ আশারূপভাবে আদায় করতে

সক্ষম না হওয়া। যেমন আপনার মাথার উপর যে বৈদুতিক পাখাটি ঘুরছে সেটি এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি যদিও তাতে বিরক্তিকর একটি শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে এমন বললে হবে না যে, এমন বিরক্তিকর শব্দ সৃষ্টি করে ফ্যানটি ফাসাদ সৃষ্টি করছে। শরীরে যখন ঘা পাচড়া হয় তখন ঐ স্থানে ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে কারন যেমন থাকা উচিত ছিল স্থানটি তেমন নেই এখন যদি কোন ডাক্তার উক্ত স্থানে অপারেশন চালিয়ে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে চান তবে রোগী নিশ্চয় কষ্ট পাবে কিছুক্ষন উচু স্বরে চিৎকার চেচামেচি করবে কিন্তু এমন বলা ভুল হবে যে, ডাক্তার ফাসাদ সৃষ্টি করেছেন বরং তিনি ইসলাহ (اصلاح) বা সংশোধন করেছেন।

আল্লাহ (ﷻ) এই আকাশ বাতাস জমিনের সৃষ্টি কর্তা তার সৃষ্টিতে তার আইন চলবে এটাই স্বাভাবিক ও আশানরূপ ছিল।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف/৫৬]

শুনে নাও সৃষ্টি করেছেন তিনি তারই বিধান চলবে তিনি মহামান্বিত, এই বিশ্বের প্রভু (আরাফ/৫৪)

কিন্তু শয়তানের দোসরে ইসলামের শত্রুরা এখানে জোরপূর্বক বাতিল আইন ও মতবাদ চালাচ্ছে। এ জমিনে যা হওয়া উচিত ছিল তার বিপরীত অবস্থা বিরাজমান। এটাই ফাসাদ। যারা কুফরী বিধান ও দর্শন টিকিয়ে রেখেছে তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী তারাই অপরাধী। এখন যদি সংশোধন করতে হয় তবে অপারেশন করতেই হবে। বাতিল পন্থিদের সাথে সংঘর্ষ ছাড়া হক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। এটাকেই যদি কেউ ফাসাদ বলেন তবে তাকে বলব আপনার অন্তরই ফাসাদের স্বীকার কারন তা সত্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, তার কাজ সে আশানরূপভাবে করতে পারেনি।

অনেকে বলেন,

- রসুলুল্লাহ (ﷺ) জিহাদ করেছেন কাফিরের বিরুদ্ধে, মুসলিমের বিরুদ্ধে আবার কিসের জিহাদ?

তাদের বলি রসুলুল্লাহ (ﷺ) যে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন তা কেন করেছিলেন? কাফিরদের সাথে কি তার বংশগত পূর্ব শত্রুতা ছিল নাকি কাফিররা আল্লাহর দিন হতে মানুষকে ফেরানোর চেষ্টা করত মুসলিমদের কষ্ট দিত আল্লাহর বিধান চলতে দিতনা এসব কারনে? বর্তমানে যেসব নেতারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে কাফিরদের কোন কাজটি তারা করেননি? শুধু মুখে নিজেদের মুসলিম দাবি করে শত ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশলে ইসলামকে ধ্বংস করার যাবতীয় চক্রান্ত করতে থাকলেও তাকে কিছুই বলা যাবে না আপনারা এমন ফতওয়াই শোনাতে চান কি?

কাকে মুসলিম বলা যায় আর কে মুসলিম হওয়ার পর আবার কাফির হয়ে যায় সে বিষয়েও এসকল ফওয়াবাজদের স্পষ্ট ধারণা নেই। তারা ফতওয়াতে পারদর্শি বটে কিন্তু জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে চরম উদাসীন। কবে ইফতাতে কোন মুফতীর নিকট কি ফতওয়া শুনে রেখেছেন সেটির বাইরে আর কিছুই নেড়েচেড়ে দেখায় সময় হয়না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ভীষন ব্যস্ত থাকেন তো তাই সবরকম পড়াশুনা থেকে অবসর নিয়েছেন। কেবল ফতওয়াবাজীর কাজটাই পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এ

গুরুদায়িত্ব হতেও তাদের আশু অবশর কামনা করি। আমরা আগেই দেখেছি যে কিভাবে একজন মুসলিম কাফির হয় সে অধ্যায়ে ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে,

وَيَخْرُوجُهُ إِلَى نِيْرُوزِ الْمَحْجُوسِ لِمُؤَافَقَتِهِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبَشْرَائِهِ يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلنَّيْرُوزِ لَا لِلْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَيَاهْدَائِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ بِيْضَةً تَعْظِيمًا لِّذَلِكَ (الفتاوى الهندية)

এবং (কোন মুসলিম কাফির হবে) যদি সে মাজুসীদের ধর্মীয় উৎসবের দিন তাদের সাথে গমন করে এবং তারা যা করে তা করে অথবা উক্ত দিনের সম্মানের উদ্দেশ্যে এমন কিছু ক্রয় করে যা সে পূর্বে ক্রয় করত না অথবা উক্ত দিনের সম্মানের উদ্দেশ্যে কোন মুশরিককে কোন কিছু উপহার দেয় যদি একটি ডিমও হয়। (98)

এসকল হুজুরদের বলি আপনারা কি দেখেননি আপনাদের নেতারা পূজা পূর্ণিমায় মঠ আর মন্দিরে প্রবেশ করে সন্যাসী পুরোহীতদের পদযুগলের সামনে মস্তকাবনত করে? তাদের উৎসবে কাড়ি কাড়ি টাকা দান করে?

এরা গর্বভরে বলে,

- আমরা সংবিধানে বিশ্বাস করি, প্রত্যেককে সংবিধান মেনে চলতে হবে, সংবিধানের বাইরে যাওয়া বৈধ মনে করি না।

কি আছে এই কাগজের স্তপটিতে যার কারনে এটাকে এত সম্মান দিতে হবে? এপ্রশ্নের উত্তর খুবই সোজা গণতন্ত্র যা কিছু বলে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে তার সবটুকুই এতে আছে।

কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ এই নাপাক কাগজ গুলোকে যারা সম্মান করে কেন তাদের মুসলিম বলা হবে?

তারা মুসলিমের ঘরের সন্তান নিজেদের মুসলিম বলেই দাবি করে একারনেই কি? কারও পরিচয় তার দাবিতে না বাস্তবতায়? যদি যে যা দাবি করে তা ঠিক হত তবে ইবলিস শয়তান মুত্তাকী বলে বিবেচিত হত কারন সে বলে ,

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) [الحشر/١٦]

আমি মহাবিশ্বের রব আল্লাহকে ভয় করি (হাশর/১৬)

মুসলিমের ঘরে জন্মানোর কারনেও কেউ জান্নাতের টিকিট পেয়ে যায় না। নুহ (عليه السلام) এর ছেলে কাফির ছিল। ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (عليهما السلام) তাদের ছেলেদের বললেন,

اَبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ [البقرة/ ১৩২]

হে আমার সন্তানেরা আল্লাহ তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন দর্শন হিসাবে মনোনিত করেছেন অতএব তোমরা যেন মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা (বাকারা - ১৩২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

হে ফাতিমা নিজেকে জাহান্নাম হতে বাচাও আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না (৯৯)

অতএব আপনার আমার বাপ-দাদার এমন কি ফজীলত আছে যে, বংশ দেখিয়ে আল্লাহর নিকট পার পেয়ে যাওয়ার আশা করতে পারেন? বরং ইসলাম হল বিশ্বাস এই বিশ্বাসে কোন হিন্দুর ছেলেও যদি গ্রহন করে তবে সে মুসলিম হয়ে যায়। বিপরীতে যদি কোন নেককার মুসলিমের ছেলেও ভুল বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় তবে সে কাফির ও জাহান্নামী হবে।

অনেকে বলে তারা তো আল্লাহতে বিশ্বাস করে, আল্লাহকে সৃষ্টি কর্তা বৃষ্টিদাতা বলে মানে।

এমন বিশ্বাস আবুজেহেল আবু লাহাবেরও ছিল। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ [يونس/৩১]

তাদের প্রশ্ন করো তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী হতে কে রিয়িক দেয় অথবা কে তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির মালিক কেই বা জীবন মৃত্যুর মালিক আর কে সর্ব বিষয়ের নিয়ন্ত্রনকর্তা তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো তোমরা তবুও কেন তাকে ভয় করো না। (ইউনুস/৩১)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (৮৬) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (৮৫) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (৮৬) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (৮৭) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (৮৮) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (৮৯) [المؤمنون/৮৬-৮৯]

তুমি বলো পৃথিবী ও এর উপর যা কিছু আছে তার মালিক কে? তারা বলবে আল্লাহ। বলো তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহন করবে না! বলো কে সপ্ত আকাশ ও মহান আরশের অধিপতি তারা বলবে আল্লাহ। তুমি বলো তবু কি তাকে ভয় করবে না! বলো কার হাতের মুঠোর ভিতর সকল বস্তুর ক্ষমতা এবং তিনি আশ্রয় দেন কেউ তার বিরুদ্ধে আশ্রয় দিতে পারে না? তারা বলবে আল্লাহ। বলো তবুও কেন প্রতারিত হচ্ছে?

(৯৯) বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ইবারত নাসায়ীর

একবার চিন্তা করে দেখুন, মক্কার মুশরিকরা সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ(ﷻ) বলেই বিশ্বাস করতো আর আপনাদের নেতারা বলে সকল ক্ষমতার উৎস জনগন এর পরও মক্কার লোকদের কাফির বলবেন আর এদের মুসলিম বলবেন কেন? পবিত্র নগরী মক্কাতে জন্মগ্রহণ করার কারনেই এমন বৈষম্য হচ্ছে কি?

মনে রাখতে হবে পছন্দমত ইসলামের একটি অংশ মেনে নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না বরং ইসলামের সকল বিধি বিধান ও আইন কানুন মেনে নিতে হবে ইসলাম ছাড়া সকল বাতিল ধর্ম ও মতবাদকে অস্বীকার করতে হবে যদি দাড়ি ওয়ালা পাগড়ি পরিহিত কোন হাজী সাহেবও কুফরী মতবাদকে মেনে নেয় তবে নিশ্চয়ই সে কাফির হয়ে যাবে যদিও সে সলাত পড়ে, যাকাত দেয়, বছরে দুই বার মক্কা গমন করে একবার হজ্জ উদ্দেশ্যে আর অন্যবার উমরা করার জন্য। ইসলামের কাজ একটি দুটি করলেই মুসলিম হয়ে যাবে এমনটি নই বরং কুফরী কাজ একচুল পরিমান করলেও কাফির হয়ে যাবে এটিই বিধান। আল্লাহ(ﷻ) বলেন,

أَفْتَوْمُنُونِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ [البقرة/১৫০]

তোমরা কি এই কিতাবের কিছু বিশ্বাস করো আর কিছু অস্বীকার করো যে কেউ এমনটি করে তার সাজা কেবল এই যে, তাকে দুনিয়াতে অপমানিত হতে হবে আর আখিরাতে তাকে ভীষন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে (বাকরা/৮৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (১৫০) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء/১৫০, ১৫১]

যারা আল্লাহ ও তার রসুলদের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তার রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় বলে আমরা কিছুর উপর ইমান রাখি আর কিছু অবিশ্বাস করি এভাবে তারা মথ্যপন্থি একটা পথ তলাশ করে ওরাই প্রকৃত কাফির তাদের জন্য প্রস্তুত আছে অপমানজনক শাস্তি। (নিসা/১৫০, ১৫১)

সুতরাং এসকল নেতা নেত্রীরা সময়পেলে সলাত পড়ে, বছরান্তরে হজ্জ করে, ভোটের সময় মাথায় রুমাল ব্যবহার করে এসব বলে তাদের মুসলিম প্রমাণ করা যাবে না কারন তাদের ঈমানে বহু সংখ্যক ছিদ্র রয়েছে। একটি নতুন টিউবের কেবল একটি স্থানে ছিদ্র হলেই যেমন তা হাওয়া ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় একটি কুফরী কর্ম করলেই মানুষের সকল আমল বিনষ্ট হয়। আবু তালিব তার সারা জীবনে কোন ভাল কাজটি করতে বাকি রেখেছিল! কিন্তু সে জাহান্নামী কারন মৃত্যুর সময় সে বলে গিয়েছিল ,

علي ملة عبد المطلب

আর রাষ্ট্রের এসব কর্নধাররা তো সকাল বিকাল কালো মায়ের বন্দনা গাচ্ছেন। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কেবলই আওড়িয়ে যাচ্ছেন আমরা গনতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, আমরা কোরআনকে মাথার উপর রাখি আর কুফরী সংবিধানকে তারচে একটু উপরে রাখি (নাউয়ু বিল্লাহ)। রাষ্ট্রময় এরা কুফর আর শিরকের চাষ করে এ ভুখন্ডকে বাসের অযোগ্য করে ছেড়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে যদি মুসলিমের বিরুদ্ধে জিহাদ হয় তবে পৃথিবীর বুকে একজন কাফিরও খুজে পাওয়া যাবে না। তখন জিহাদ হবে মঙ্গল গ্রহে অথবা বিরান চন্দ্র পৃষ্ঠে। আমি এসব ফতওয়াবাজদের বলি মঞ্চে মিস্বারে ওয়াজ নসীহত ছেড়ে আর এক বার মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়ে কোন যোগ্য উস্তাযের কাছ থেকে (أَسْلَمَ يُسْلِمُ إِسْلَامًا فَهُوَ مُسْلِمٌ) এর দারস গ্রহন করুন। যদিও যোগ্য উস্তাদ পাওয়াটা খুবই দূরহ তবে ভাগ্য ভাল হলে পেয়েও যেতে পারেন।

<# জিহাদ করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা শর্ত কি? #>

যাদের সাহস মোটামুটি একটু বেশি তারা বলেন,

- জিহাদ তো নিশ্চয় আছে কোরআনে হাদীসে ইহা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু রসুলুল্লাহ (ﷺ) মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ করেননি তাই যতদিন না মুসলিমরা কোন ভুখন্ডে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে ততদিন জিহাদ করা যাবে না।

এই ফতওয়াটি খুবই চমৎকার এতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙেনা। এসকল পণ্ডিতরা জিহাদকে সরাসরি অস্বীকারও করছেন না আবার এমন এক লেজ জুড়ে দিয়েছেন যাতে জীবনে কখনও যুদ্ধ জিহাদ করতে না হয়। ছোট বেলায় নানী দাদীর কাছে নিশ্চয় বিভিন্ন রাজার কাহিনী শুনেছেন,

- এক ছিল রাজা তার ছিল সাত রানী

সাত রানী ছাড়া যেন রাজার গল্পই জমে না। আমি কিন্তু একটা রাজার গল্প জানি যার কোন রানী ছিল না। আসলে রাজা কোন রমনীর পানি গ্রহনে আগ্রহীই ছিলেন না। তিনি পৌরুষত্বের স্বাদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিলেন। নিজে কখনও বিবাহ না করলেও প্রায়ই শুনতেন তার দরবারের পদস্তু ব্যক্তির মোটা অংকের পন দিয়ে বিবাহ করছেন। রাজার কেবলই ভাবেন

এরা বৃথা টাকা খরচ করে কেন?

একদিন তরুন সেনাপতি বিবাহের জন্য রাজার অনুমতি চাইলে তার মাথা গরম হয়ে যায়। তিরস্কার করে বলে ,

(100) বুখারী কিতাবুল জানাঈয বাবু ইয়া কলাল মুশরিক ইনদা মাওতিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুসলিম কিতাবুল ইমান বাবু আওয়ালুল ইমান কওলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

- তোমরা কেন বাপু অকারনে টাকা পয়সা খরচ করো! রাজ্যে ঘোষণা করে দাও আজকের পর থেকে কেউ কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না।

সেনাপতি তো ভীষন বিপদে পড়ে গেল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নগদ টাকা খরচ করে যে পণ্ডিত পোষা হত তার কাছে কাকুতি মিনতি করে বলল,

- আপনি দ্রুত মহারাজকে এই নির্দেশ উঠিয়ে নিতে বলুন তা না হলে কিন্তু রাজ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে।

পণ্ডিত মশায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজের সামনে হাজিরা দিলে মহারাজ তাকে বলল।

- মহাশয়, নির্দেশ আমি তুলে নেব কিন্তু আমাকে বোঝাতে হবে কি কারনে একজন পুরুষ একটা মেয়েকে বিবাহ করে।

পণ্ডিত মশায় তো পড়ল মহা বিপদে সারা জীবন বিদ্যা দিয়ে কেবল টাকাই কামায় করেছেন কিন্তু বিদ্যা ব্যবহার করে দুর্বোধ্য বিষয় বোধগম্য করার কোন চেষ্টা তো তিনি করেন নি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে একটা উত্তর পেয়ে গেলেন আমতা আমতা করে বললেন।

- মহারাজ, মেয়েরা সন্তান লালন পালন করে তাদের খাওয়ায়, গোসল করায়।

পণ্ডিতের কথায় কাজ হল মহারাজ বললেন,

- ও আচ্ছা এই ব্যাপার তাহলে রাজ্যে ঘোষণা করো যার সন্তান নেই সে শাদী করতে পারবে না।

পণ্ডিত মশায় বেজায় খুশি হয়ে বলেন ,

- যথা আজ্ঞা মহারাজ।

ফিরে এসে তরুন সেনাপতিকে সব খুলে বললে সে ভীষন রেগে গিয়ে বলে ,

- কিন্তু মহাশয় বিয়ে না করলে ছেলে সন্তান হবে কি করে?

এসব পণ্ডিতরাও অনুরূপ কাণ্ডই ঘটিয়েছেন। জিহাদ নিষিদ্ধ নয় কিন্তু শর্ত হল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কিন্তু জিহাদ ছাড়া যে, ইসলামী রাষ্ট্রের জন্মই হবে না এটা তারা বেমালুম ভুলে বসেছেন। তারা কি মনে করেছেন ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়া পর্যন্ত আমরা জিহাদ করব না এমন ঘোষণা শোনার সাথে সাথে এই অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাফিররা সিংহাসন ছেড়ে বনে জঙ্গলে সন্যাসব্রত পালনে মন দেবে? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যেমন কাফিররা সে রাষ্ট্রে হামলা চালাবে তেমনি কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ব্যাপারে আসজ্ঞা হলে জনের আগেই সেটা ভুল করে দেওয়ার কোন চেষ্টায় কি তারা করবে না? ফিরআউন কি মুসা (ﷺ) এর জনের আগেই তিনি যাতে পৃথিবীতে আসতে না পারেন সে চেষ্টা করেনি? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সেই সম্ভবনা বানচাল করতে আসলে যদি

তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা না যায় তবে তো কাফিরদের কোন ভয়ই থাকলো না।

সুরা মায়েদার ২১ থেকে ২৬ নং আয়াতে আমরা দেখেছি যে, বানী ইসরাইল যখন মিসর হতে বের হয়ে আসল তখন তাদের বায়তুল মাক্দীসের এলাকাতে প্রবেশ করতে বলা হল এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে উক্ত ভূখন্ড দখল করে নিতে বলা হল। তখন তাদের কোন রাষ্ট্র ছিল না।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যখন চুক্তি হল মক্কা হতে যে মুসলিমই মদীনাতে পালিয়ে আসবে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তখন আবু বাশীর (رضي الله عنه) মদীনাতে পালিয়ে আসলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেন। মক্কার মুসলিমরা যখন বুঝতে পারল মদীনাতে গেলে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা পালিয়ে মদীনাতে না এসে একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিত। এ পাহাড়ের পাশ দিয়ে কাফিরদের যে কাফিলায় গমন করত তারা তার উপর হামলা করত। ফলে একসময় কাফিররা রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে অনুরোধ করলেন ওদের মদীনাতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য।⁽¹⁰¹⁾

এ সকল মহামান্য সাহাবাদেরও কোন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল না তবু তারা সাধ্য মত কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে।

এছাড়া মুসলিমদের ইজমা যে, যদি হঠাৎ মুসলিম বিশ্বের খলীফা কাফির হয়ে যান তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা মুসলিমদের উপর ফরজ

ইমাম আননাব্বী বলেন,

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انزعزل

কাদী ইয়াদ বলেন আলেমরা ইজমা করেছে যে, কোন কাফির মুসলিমদের খলীফা হতে পারবে না এবং যদি মুসলিম খলীফা পরে কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।

(শারহে মুসলিম)

এখানেও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ ফরজ হয়েছে।

যারা মনে করেন মদীনার রাষ্ট্র কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা কি বলবেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (رضي الله عنه) আর ইয়াহুদী নেতারা স্বেচ্ছায় এবং স্বতস্কর্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রকে মেনে নিয়েছিল? তারা কি পরধর্মের প্রতি আপনাদের মত সহিষ্ণু ছিল? মদীনার দুটি গোত্র আওস এবং খাযরাজ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করে ক্লান্ত হয়ে শেষে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিজেদের বাদশা হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আগমন তার সব আশা ভঙ্গুল করে দেয় সে যাতনা তাকে এতই বেশি ভুগাতো, যে পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিকতার চাপে বাধ্য হয়ে মুসলিম হওয়ার পরও

(101) বুখারী কিতাবু আশশুর্কত বাবু

সুযোগ পেলেই ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে ক্রটি করতেন।⁽¹⁰²⁾ রসুলুল্লাহ (ﷺ) হিজরত করে মদীনাতে আসলে ইয়হুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব তার সাথে সাক্ষাত করে ফিরে আসলে তার ভাই আবু ইয়াসীর বলল,

أهو هو

ইনিই কি আল্লাহর রসুল (ﷺ)

হুয়াই ইবনে আখতাব বলল,

نعم والله

হ্যাঁ আল্লাহর কসম।

আবু ইয়াসীর বলল,

أتعرفه وتثبته ؟

আপনি কি তাকে পরিষ্কার ভাবে চিনতে পেরেছেন?

হুয়াই ইবনে আখতাব বলল,

نعم

হ্যাঁ

আবু ইয়াসীর বলল,

فما في نفسك منه ؟

আপনি তার সাথে কেমন আচরণ করতে চান?

ইয়হুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব বলল,

عداوته والله ما بقيت

আল্লাহর কসম যতদিন বেচে থাকি ততদিন তার সাথে শত্রুতাই করে যাব।⁽¹⁰³⁾

⁽¹⁰²⁾ বুখারী কিতাবুত তাফসীর সুরাতু আলে ইমরান, মুসলিম কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাযরি বাবু দুআইন নাবিয়্যি (ﷺ)

ইলাল্লাহ ওয়া সবরুহু আলা আযাল মুনাফিকীন।

⁽¹⁰³⁾ ইবনে হিশাম, আরবাহীকুল মাখতুম

একবার চিন্তা করুন তো, যদি এসকল হিংসুকের দল জানতে পারত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাহাবারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ নিষিদ্ধ মনে করে তবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) মদীনা প্রবেশের আগেই তাকে ছানিয়্যতুল ওয়াদা (মদীনার অদূরবর্তী একটি অঞ্চল) থেকেই বাধা দেওয়ার জন্য জীবন দিয়ে চেষ্টা করত কিনা। তারা যদি তাই করত তবে কি মনে করেন সাহাবারা সত্যি সত্যিই আপনাদের মত অহিসং নীতি আবলম্বন করতেন? এবং মদীনাকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও জিহাদ ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় কিনা তার জন্য অপেক্ষা করতেন?

জিহাদের আয়াত মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল⁽¹⁰⁴⁾ একারণে ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া যদি জিহাদ করা না যায়

(104) অনেক সীরাত গ্রন্থকার বলেনছেন হিজরতের পূর্বেই দ্বিতীয় বায়াতে আকাবার সময় জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বায়াতে আকাবাতেরই আনসার সাহাবাদের নিকট হতে যুদ্ধের বায়াত নেওয়া হয়েছিল

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে হিজরাতের পূর্বে দ্বিতীয় আকাবার শপথে আনসারদের নিকট হতে যুদ্ধের বায়াত গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইবনে হিশাম বলেন,

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْحَرْبِ حِينَ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الْقِتَالِ شُرُوطًا سَوَى شَرْطِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقْبَةِ الْأُولَى ، كَانَتْ الْأُولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرْبِ فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا ، وَبَايَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقْبَةِ الْآخِرَةِ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ

ইবনে ইসহাক বলেছেন দ্বিতীয় আকাবার শপথকে যুদ্ধের শপথ বলা হয় কারন তখন আল্লাহ তার রসুল (ﷺ) কে জিহাদের অনুমতি দিয়েছিলেন এই বায়াতে প্রথমের বায়াতে যেসব শর্ত করা হয়েছিল তার চেয়ে অধিক কিছু শর্ত করা হয়েছিল। প্রথম বায়াতটি ছিল মেয়েদের বায়াতের মত কেননা আল্লাহ তখনও জিহাদ ফরজ করেননি অতএব যখন আল্লাহ জিহাদের অনুমতি দিলেন তখন তিনি আকাবার শেষ শপথে কালো এবং সাদা (সমস্ত মানুষের) সাথে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করেন।

(ইবনে হিশাম)

দ্বিতীয় বায়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবী উবাদা ইবনে সামিত বলেন,

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الحرب

আমরা আল্লাহর রসুলের হাতে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করেছিলাম।⁽¹⁰⁴⁾

ইবনে জারীর তাবারী বলেন,

وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع من الأوس والخزرج في العقبة الآخرة وهي بيعة الحرب حين أذن الله عز وجل في القتال بشروط غير الشروط في العقبة الأولى وأما الأولى فإمما كانت على بيعة النساء على ما ذكرت الخبر به عن عباد بن عباد بن الصامت قبل وكانت بيعة العقبة الثانية على حرب الأحمر والأسود

আল্লাহর রসুল (ﷺ) আওস ও খাজরাজের বেশ কিছু ব্যক্তির সাথে শেষ আকাবার বায়াত গ্রহণ করেছিলেন আর এই

তবে হজ্জ যাকাত সওম এসংক্রান্ত আয়াতও তো মদীনাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল এসব ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না কেন? আসলে ইসলামের বিধানই এই যে, যখন কোন হুকুম মানসুখ হয়ে যায় তা আর ফিরে আসেনা। প্রথমে জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল পরে আল্লাহ তা বৈধ ও ফরজ করেছেন এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধানই বলবত থাকবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন

الخیل معقود فی نواصیها الخیر إلى یوم القیامة الأجر والمغنم

ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যান লেখা রয়েছে পুরস্কার এবং গণীমত। (105)

এখন যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া বা অন্য কোন শর্ত আরোপ করে জিহাদকে রহিত করতে চান তাকে বলব কোন ইমাম জিহাদের শর্তের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন?

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ

বায়াতকেই যুদ্ধের বায়াত বলা হয়। সে সময় আল্লাহ তার রসুল (ﷺ) কে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। এই বায়াতে এমন কিছু শর্ত করা হয়েছিল যা প্রথম আকাবার শপথে করা হয়নি সেটি ছিল মেয়েদের বায়াতের মত পূর্বে উবাদা ইবনে সামিতের বর্ণনা হতে আমরা তা উল্লেখ করেছি। কিন্তু দ্বিতীয় বায়াতে আকাবাতের সাদা কালো (সমস্ত মানুষের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআনে বলেন,

قَالَ عَلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْحَرْبِ ، وَلَمْ تُجَلَّ لَهُ الدِّمَاءُ

আমাদের আলেমরা বলেছেন আকাবার শপথের পূর্বে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তার জন্য রক্ত ঝড়ানোও বৈধ হয়নি।

(আহকামুল কুরআন ইবনে আরাবী)

তাহলে দেখা যাচ্ছে এসব আলেমদের মতে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে বায়াতে আকাবার সময়ই জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য কিছু আলেম বলেছেন মদীনাতে হিজরতের পর জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মদীনাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিমদের জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি কথাটি নিশ্চিত নই তবু আমরা সেটাকে সত্য ধরে নিয়েই আলোচনা করছি যাতে পাঠক বুঝতে পারেন জিহাদের অনুমতি যদি সত্যি সত্যিই মদীনাতে হিজরতের পর এসে থাকে তার অর্থও এই নই যে এখনও পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া ছাড়া জিহাদ করা যাবে না।

(105) বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাযর বাবুল জিহাদ মাদিন মাআল বিররি ওয়াল ফাজির, মুসলিম কিতাবুল ইমারা বাবু আলখায়লি ফি নাওয়াসিহি আল খয়র ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ

-৪ লেখকের অন্যান্য বইসমূহ :-

- ১। হরীণ নয়না হ্রদের কথা। [জান্নাতী স্ত্রীদের বর্ণনা]
- ২। কবিতায় জান্নাত।
- ৩। আলইতকান ফি তাওহীদির রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
- ৪। নাস্তিকতার অসারতা
- ৫। জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
- ৬। ভেজালে মেশাল
- ৭। দরবারী আলেম
- ৮। মারেফাত
- ৯। আত-তাবঈন ফি হুকমিল উমারা ওয়াস-সালাতীন
- ১০। মাযহাব বনাম আহ্লে হাদীস
- ১১। না'ফউল ফারিদ ফি জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ [উসুলে ফিকহ্]
- ১২। ছোটদের আক্বাইদ
- ১৩। তাইসিরুল ক্বওয়াঈদ [আরবী গ্রামার]
- ১৪। যাকাতের মাসয়ালা-মাসায়েল
- ১৫। লাইলাতুল বারায়াহ্ [শবে বরাত সম্পর্কে]
- ১৬। চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে।
- ১৭। আরব মরণতে শিক্ষা সফর [ইসলামী উপন্যাস]
- ১৮। পরিবর্তন [ইসলামী উপন্যাস]
- ১৯। ছোটনের রোজী আপু [ছোটদের ইসলামী উপন্যাস]
- ২০। সান্টু মামার স্কুল [ছোটদের ইসলামী উপন্যাস]
- ২১। মাসাইলুল ই'তিকাফ [আরবী]
- ২২। আজ-জাব্বু আনিল মাযাহিব আল আরবায়া [আরবী]
- ২৩। আত-তায়ফাতুল মান-ছুরাহ্ [আরবী]
- ২৪। আরাবিয়্যাতুল আতফাল [ছোটদের আরবী শিক্ষা]
- ২৫। আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম [কারো সম্মানে দাড়াণো বা মিলাদে কিয়াম করার বিধান]
- ২৬। বিদয়াত
- ২৭। হুসাইন ইবনে মানছুর আল হাল্লাজের জীবনী

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪, ০১৭৬১৮৫৩২৫৪

